আনন্দমেলা

৫ নভেম্বর ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশন •
২/-

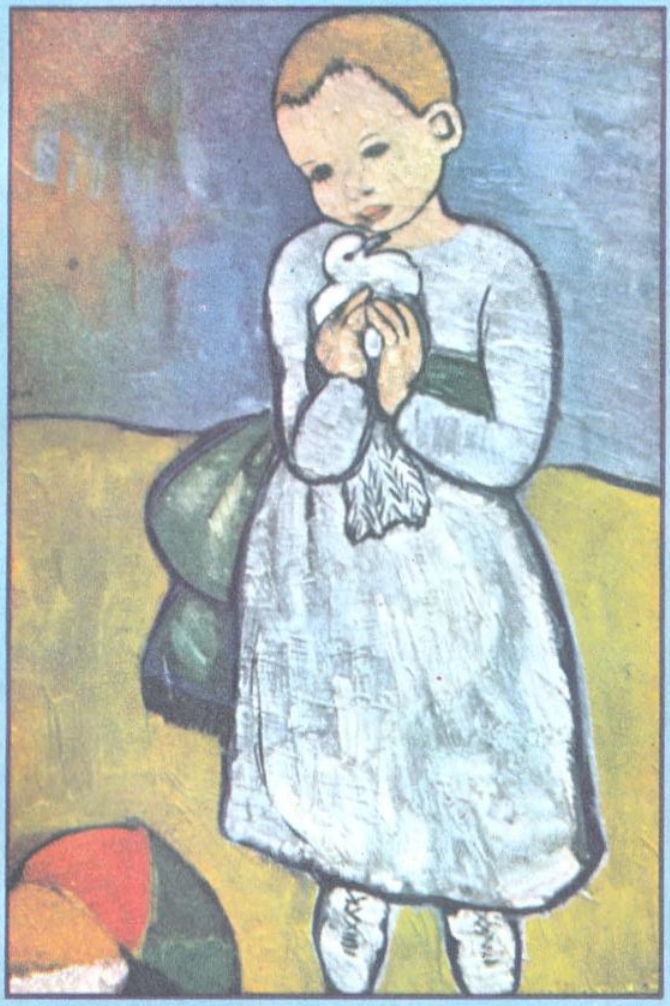

"বালী বালী, শক্ত দানার টুথ পাউডার আপনার দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

আনন্দমেলা

২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ • ১৮ নভেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৬ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

পাবল্যের ছেলেবেলা। সন্দীপ সরকার ৪

গল্প

শুধু ছায়া। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১০
সুজয়ের জাদুঘর। শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪
সীমানার লড়াই। আরতি দাস ৩৬

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২১
সিসের আঙটি। বিমল কর ৫৩

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৭

ছড়া

কাশীদার হাসি। রঞ্জন ভাদুড়ী ৪৯
ব্যাকরণ-বীর। পবিত্র সরকার ৪৯

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি. কে. ৫৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

খেলাধুলো

মারডেকার ভারত। শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪২
কেউ জেতেনি, কেউ হারেনি। বাপ্পসেন ৪৪
হরজিন্দর সিংয়ের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৫১
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৩৯
বই সংগ্রহের বাতিক। জীবন ভৌমিক ৪৭
ছবির মজা ৫৯, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ : পিকাসোর 'শিশু'

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়

সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান

যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই

কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

পাবলোর ছেলেবেলা

সন্দীপ সরকার

সন ১৮৯৫। স্পেনের বারসিলোনা শহর। এখানকার চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন অধ্যাপক জোসে রুইজ ব্লাসকো। বারসিলোনায় এসে বন্দরের কাছেই বাসা ভাড়া করেছেন। কাছেই সমুদ্র। মহাবিদ্যালয়ও অদূরে। অধ্যাপকের বড় ছেলে পাবলোর বয়স মাত্র চোদ্দ। ছেলেটির আঁকা এমন নিখুঁত যে তা দেখে উঁচু ক্লাসে ভর্তি হবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। এক মাস ধরে পরীক্ষা চলবে। দেখে দেখে আঁকতে হবে একটা বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা লোককে আর একটা প্লাস্টারের পা। পাবলো নির্ধারিত সময়ের আগেই সে ছবি শেষ করল।

পাবলো নামটা স্পেনে বেশ চালু। এই শতাব্দীতে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত পাবলো ছিলেন। একজন পাবলো কাসালস। পশ্চিমি ধ্রুপদী সঙ্গীতে চেলো বাজানোর জাদুকর। অন্যজন পাবলো নেরুদা। স্পেনীয় ভাষায় লিখতেন। চিলির মহাকবি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। কিন্তু তিনজন পাবলোর মধ্যে আমাদের পাবলোর খ্যাতি সব চাইতে বেশি। বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন বংশের একমাত্র পিদিমের দেড় কিলোমিটার নাম রেখেছিলেন, পাবলো, ডিয়াগো, জোসে, ফ্রানসিসকো ডি পাওলো, হুয়ান নেপোমুচেনো, মারিয়া লস রেমেডিয়াস, সিপ্রানো ডি লা সান্তিসিমা ত্রিনিদাদ। কিন্তু এত নামের মধ্যে তিনি পাবলো নামটাই বেছেছিলেন।

একশো বছর আগে ২৪ অক্টোবর ১৮৮১-তে জন্মেছিলেন আমাদের পাবলো

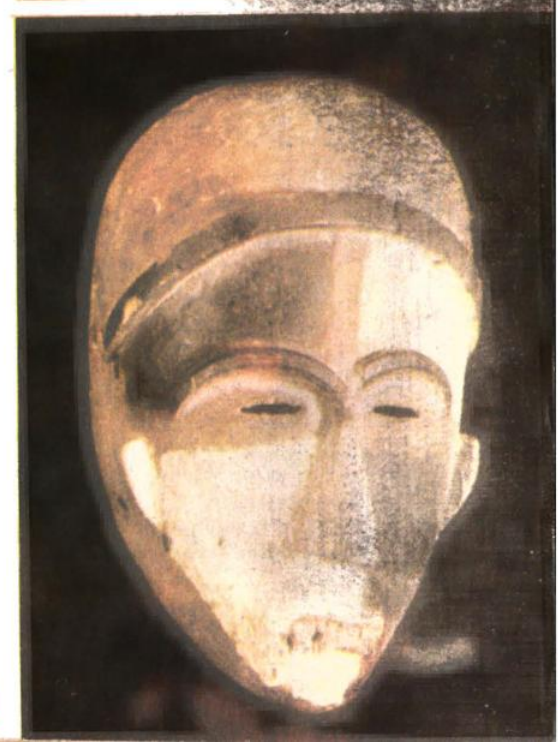

(বাঁয়ে) প্রতিকৃতি; (ডাইনে, উপরে) মধ্যযুগীয় নাইট; (ডাইনে, নীচে) মুখোশ

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ—যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

কি ক'রে দেখুনঃ

- প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
- ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
- ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ কয়মুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে যেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর প্রতিষেধক

OBM 2115 R BN

স্পেনের মালাগা বন্দরে। মায়ের নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ। গোড়ায় ওঁর নাম ছিল পাবলো রুইজ। মাকে বড় ভালবাসতেন পাবলো। স্পেনের রীতি অনুসারে মায়ের নামও পদবি করা যায়। একটা সময় তিনি পাবলো রুইজ পিকাসো সই করতেন ছবিতে। শেষে নামটো ছেঁটে ছোট্ট করলেন—পাবলো পিকাসো।

বিশ্বের শিল্পকলার বেশ কিছু মহাশিল্পীর জন্মভূমি স্পেন। যেমন ভেলাস্কুজ, এল গ্রেকো, গোইয়া। পাবলো পিকাসো এঁদের উত্তরসূরি। বিচিত্র সুন্দর দেশ। পিরানিজ পর্বতমালা। আঙুরবাগান। এসেছে প্রাচীনকালে রোমানরা। পরে মুসলমান-শিক্ষার পীঠস্থান হয়েছিল স্পেনের কারডোভা বিশ্ববিদ্যালয় মুরদের আমলে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের ঐতিহ্য আর কুসংস্কার জনজীবনে ছাপ ফেলেছিল। শেষে শোষণে-শাসনে সবাই রীতিমত বিপ্লবী হয়ে গেলেন। এর মধ্যেই জন্মেছিলেন পাবলো। স্পেনীয়দের মতো ষাঁড়ের লড়াই দেখতে খুব ভালবাসতেন।

পাবলো পিকাসো শুধু এই শতাব্দীর নন, সর্বকালের মহাশিল্পী। মারা যান ৮ এপ্রিল, ১৯৭৩-এ ৯৩ বছর বয়সে। প্রতিদিন কত যে ছবি এঁকেছেন তার হিসেব নেই। মূলত চিত্রকর হলেও, ভাস্কর্য, ছাপাই-ছবি, চিনেমাটির বাসনপত্তরের নকশা এবং নকশিকাটায় তিনি তাঁর প্রতিভার ছাপ ফেলেছেন।

স্পেনীয় হলেও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ফ্রান্সে। আঠারো বছর বয়সে ফরাসি দেশে এসে অনাহারে, অর্ধাহারে বহু বছর পরিশ্রম করে তিনি খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিলেন। শুধু শিল্পী হয়ে কোটি-কোটি টাকা রোজগার করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর দুঃখী অভাজনদের ছবি এঁকেছেন। নিজেকে তাঁদের একজন বলে মনে করতেন। সব মানুষের জন্য মমত্ব তাঁর ছবিতে ছায়া ফেলেছে। অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন ছবিতেই। তাই তাঁর মৃত্যুতে সকলেই প্রিয়জন হারানোর ব্যথা পেয়েছেন।

চারপাশের জগৎ তিনি নতুন করে দেখতে শিখিয়েছেন। ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া যে হুবহু কোনো কিছুর নকল করা নয়, তোমরা যারা ছবি আঁকো তারা জানো। বরং কল্পনা করে সবকিছুকে নতুন করে নাও—তাই না? কথাটা নতুন নয়। কিন্তু নিজের আঁকা ছবি মূর্তির মধ্যে দিয়ে এ-কথা পাবলো আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। যদিও হুবহু ছবি আঁকায় পাবলোর সমকক্ষ খুব কম! তাঁর বন্ধু ফরাসি কবি গিওম অ্যাপলনিয়ের বলেছিলেন, "আমার মনে হয় প্রকৃতির কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ফোটোগ্রাফারের মতো তাকে নকল

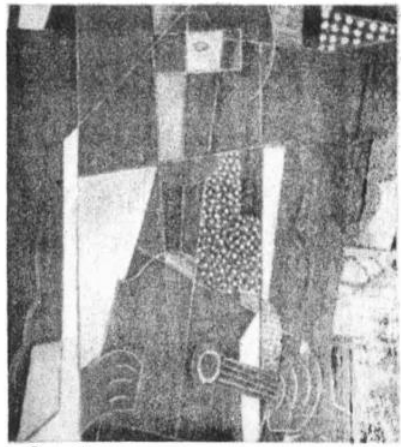

বাড়ির ধাঁচে মানুষ

করার জন্য নয়। যখন মানুষের দরকার পড়ল পা-গাড়ির মতো একটা যন্ত্র তৈরি করার, তখন সে তৈরি করল চাকা। চাকা তো আর পায়ের মতো নয়!" কথাটা ছবি, মূর্তি দেখার সময় মনে রাখতে হবে।

পাবলোর বাবা জোসে রুইজ ছিলেন লম্বা। মাথায় লাল চুল। পুরুষালি চেহারা। কথা কম বলতেন বলে লোকে আড়ালে বলত 'গোমড়ামুখো ইংরেজ'। তিনি এগারোজন ভাইবোনের মধ্যে নবম। পেশাদার চিত্রকর। প্রতিভাবান ছিলেন না। রোজগারও বেশি করতেন না। পাবলোর মা ডনা মারিয়া ছিলেন ছোটখাটো আমুদে মানুষ। কালো চুল আর কালো চোখ ছিল তাঁর। পাবলো ছিলেন মায়ের মতো দেখতে। জোসে রুইজের ভাইবোনদের কারও ছেলে ছিল না। পাবলো একমাত্র বংশধর। সুতরাং পাবলো জন্মালে ওঁদের সবার খুব আনন্দ হয়েছিল।

বুড়ো বয়সে ডনা মারিয়া তাঁর পাবলিটো

(উপরে) ল্যাণ্ডস্কেপ (নীচে) বাদ্যযন্ত্র

সম্বন্ধে গল্প বলতেন, "বাছা আমার, অন্য সব কথার আগে শেখে 'পিস' শব্দটা, 'লাপিস' বলতে পারত না ছোট্ট সোনা। (লাপিস মানে পেন্সিল) একবার লাপিস পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হিজিবিজি কেটে কাটিয়ে দিত।" ছোটবেলা থেকে পাবলো একটু অন্যরকম। গল্প আছে তিনি বিস্কুট আছে জেনে সেটা পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে হাঁটতে শিখেছিলেন। ভেতরে পুরস্কার কী আছে জানা, কিন্তু আগে কাজটা শিখে নিতে হবে।

তখন প্যাবলোর বয়স তিন বছর। হঠাৎ মালাগায় ভূমিকম্প শুরু হল। শীতের বিকেল। জোসে রুইজের মনে হল ওঁদের বাড়িটা তেমন মজবুত নয়। ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া নিরাপদ। পাবলোর মনে এই ঘটনা গভীর দাগ কেটেছিল। পঞ্চাশ বছর পরে এই ঘটনার কথা বলার সময় পাবলো বলেছেন, "আমার মা মাথায় একটা রুমাল বেঁধেছিলেন। ওঁকে এমন সাজে কখনো দেখেনি। আর বাবা একটা ক্লোক

কাঁধে ফেলে তার মধ্যে আমাকে জড়িয়ে নিলেন। আমার মুণ্ডুটাই শুধু বেরিয়ে রইল।"

জোসের পক্ষে সংসার চালানো দায় হল। তিনি তখন মালাগার কলাভবনে অধ্যাপক হলেন। সেই সুবাদে শহরের জাদুঘরের বড়কর্তা। পাবলো বাবার সঙ্গে ছবি আঁকেন। পায়রা আঁকতেন জোসে। কিংবা প্লাস্টারের গ্রীক দেবীকে দেখে একটু অদলবদল করে যিশুর মা মেরিকে এঁকে ফেলতেন। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুল, জগ বা গ্লাস, বা ফলদানিতে ফল সাজিয়ে আঁকতেন। ছেলেকে এসব আঁকা শেখাতেন। বাবা পোষা পায়রা সামনে রেখে আঁকতেন। পাবলোর জন্য মরা পায়রার পা বোর্ডে টাঙিয়ে দিতেন। পাবলো নানা কোণে দাঁড়িয়ে পা-টাকে বার বার আঁকতেন। এইভাবে আঁকাটা মুখস্থ হয়ে যেত। শেষ বয়সে বিশ্বশান্তির প্রতীক এঁকেছিলেন পায়রা। **ছেলেবেলার** ঘটনা মনে করেই হয়তো।

জোসের মাথায় দুর্ভাবনা। ছবি আঁকায় পাকা হলেও পাবলো লেখাপড়ার ধার দিয়ে যায় না! অঙ্ক দেখলে পালায়। স্কুলে ভর্তি করার জন্যে জোর করে নিয়ে গেলেন। মাস্টারমশাই জোসের বন্ধু। তিনি বললেন, "কী জানো, বলো তো খোকা?" পাবলো বলল, "কিস্‌সু জানি-টানি না।"

পর-পর সংখ্যাগুলো ঘর কেটে ওপর থেকে নীচে লিখতে বললেন। একেবারে অসম্ভব। বন্ধুর ছেলে। স্কুলে নিতেই হবে। বোর্ডে সংখ্যাগুলো লিখে বললেন, "লেখো তো খোকা।" খোকা দেখে দেখে হুবহু এঁকে ফেলল। স্কুলে পড়াশুনোর চাপ বেশি ছিল না। অযথা বই মুখস্থ করানো হত না তাই রক্ষে!

জোসের সংসার ভাল চলে না। পাবলোর পর দুই বোন লোলা আর কনচিটা। বাধ্য হয়ে জন্মস্থান মালাগা ছেড়ে চাকরি নিলেন স্পেনের অপর প্রান্তে কোরুন্নার কলাভবনে। দক্ষিণ ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর স্পেনের অতলান্তিকের তীরে। এখানে শীত পড়ে বেশি। সূর্যের মুখ দেখা যায় না। জোসে তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ছোট্ট **কনচিটাকে** ভালবাসতেন বেশি। মেয়েটি অবিকল বাবার মতো দেখতে। সে ডিপথিরিয়ায় মারা গেল। ওই আঘাতে ভেঙে পড়লেন জোসে।

পাবলোর দশ বছর বয়স। ক্লাসে না গিয়ে বাবার স্টুডিওতে ছবি আঁকেন। দেখে নকল করা বাদ দিয়েও মন থেকে ছবি আঁকে। হাতে লেখা পত্রিকা বার করে। তাতে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে। শিরোনাম লেখে: অঙ্ক পরীক্ষা। শিক্ষক: যদি আমি তোমাকে পাঁচটা তরমুজ দি আর তুমি চারটে খেয়ে ফেল, কটা থাকে? ছাত্র: একটা। শিক্ষক: দেখো বদহজম যেন না হয়!

পাবলো বাবাকে পায়রা আঁকায় বা টেবিলে জিনিস সাজিয়ে ছবি আঁকায় সাহায্য করত

দুটি মেয়ে

একদিন মন এত খারাপ জোসের যে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। পাবলো দ্রুত বাবার ক্যানভাসে তেলরঙে পায়রা এঁকে রপ্ত করল। চোদ্দ বছরের পাবলো। কিন্তু হাতটা পাকা। জোসে বহুক্ষণ পরে ফিরে এসে ক্যানভাস দেখে অবাক। মন ভরে গেল জোসের। শিল্পী হিসাবে ব্যর্থ তিনি, কিন্তু তাঁর ছেলে বড় শিল্পী হবেই।

নিজের তুলি, বর্ণপাত্র, রঙ, ছুরি পাবলোর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি আমার চেয়ে ঢের ভাল ছবি আঁকো। এখন থেকে আমি আর ছবি আঁকব না।"

শুধু ছায়া

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮০ সালের ২৯ এপ্রিল স্টেটসম্যানে একটি খবর বেরিয়েছিল—সুইডেন অনাথ শিশুদের স্বর্গ। ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ হাজার অনাথ শিশু এখন সুইডেনের বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু সুইডেনের এইসব অনাথ শিশুদের নিয়ে আজ আমি কোন প্রবন্ধ ফাঁদতে বসিনি। সুইডেনের অনাথ শিশুদের খবরটি আমি যখনই কাগজে পড়লাম তখনই আমার মনে পড়ে গেল উলরিখ হার্জের কথা। মিঃ হার্জ, মিসেস হার্জ আর তাঁদের দত্তক নেওয়া ছেলে ভিক্টরের কথা। মনে পড়ে গেল ঠিক এক বছর আগে অকটোবর মাসে বোধি গয়ার সেই ভয়ংকর ঘটনাটির কথা। পাটনার সার্চলাইট পত্রিকায় সেই ঘটনার এক নাটকীয় বিবরণ বেরিয়েছিল। যার হেডলাইন ছিল—হরিজন মহিলাকে গুলি করার অভিযোগে বিদেশী পর্যটক গ্রেফতার। খবরটি ছিল এইরকম: বিদেশী পর্যটক উলরিখ হার্জ (৫০) গতকাল রাত ন'টা নাগাদ বোধি গয়ার থাই বুদ্ধ-মন্দিরের কাছে এক হরিজন মহিলাকে গুলি করেন। গুলি করার কারণ জানা যায়নি। তবে পুলিশের অভিযোগ, ওই মহিলা বোধি গয়ার বিদেশী পর্যটকদের কাছে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মিঃ হার্জের কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বিরক্ত হন, কিন্তু মহিলা বার বার তাঁর কাছে ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি ক্রোধের বশে রিভলভার বার করে পর-পর দু-রাউণ্ড গুলি ছোঁড়েন। তার মধ্যে একটি গুলি মহিলার বুকে লাগে। হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

আততায়ী উলরিখ হার্জের বাড়ি দক্ষিণ সুইডেনের গটেবর্গ শহরে। তিনি, তাঁর পত্নী ও তাঁদের ভারতীয় দত্তক পুত্র ভিক্টরকে (৮) নিয়ে ভারত পর্যটনে এসেছিলেন।

সার্চলাইটের পাতায় এই খবরটা পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। সে-সময় আমি রাজগিরে। ঘটনার দিন সকালেই আমি বোধি গয়া থেকে রাজগির পৌঁছেছি। তার আগের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত ট্যুরিস্ট লজের লনে বসে আমি আর মিঃ হার্জ গল্প করেছি। আর সেই রাতেই লনে বসে উলরিখ আমাকে শুনিয়েছিলেন অত্যাশ্চর্য এক অলৌকিক কাহিনী, যে কাহিনী তাঁর দত্তক ছেলে ভিক্টরকে নিয়ে। বলেছিলেন, শুধু শান্তি পাবার আশায়, শুধু নিশ্চিন্ত এক ভবিষ্যতের সন্ধানে এত টাকা খরচ করে উলরিখ দম্পতি এই গয়াতে ছুটে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। নয়তো এমন এক শোচনীয় ঘটনা তাঁদের জীবনে ঘটবে কেন?

উলরিখের কাহিনী বলতে গেলে প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। আমার পরলোকগত পিতৃদেবের পারলৌকিক কাজ করার জন্য গয়ায় এসেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, গয়ায় পিণ্ডদান করে বোধি গয়ায় দিন-দুয়েক থাকব। তারপর সেখান থেকে চলে যাব রাজগির। ওখানে তিন-চার দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরব।

গয়ায় ফল্গু নদীর ধারে বসে শ্রাদ্ধ করছি। দেখি কিছু দূরে এক বিদেশী দম্পতি, আর তাঁদের সঙ্গে বছর আট-দশের একটি ছেলে। ছেলেটির রঙ কালো। মুখের আদল ভারতীয়।

মুণ্ডিত মাথা। পরনে ধুতি। খালি গা। বিদেশী ভদ্রলোকের পরনে টাউজার্স, গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। ভদ্রমহিলার পরনে স্কার্ট। হাতে একটি চামড়ার ব্যাগ, আর মুভি ক্যামেরা। ভদ্রমহিলা মাঝে-মাঝে ছবি তুলছিলেন।

ইউরোপীয়ান দম্পতি ফল্গু নদীর তীরে অনেক সময় পিণ্ডদান অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। কিন্তু ওই ছেলেটি কে? তার সঙ্গে ওই দম্পতির সম্পর্ক কী? ছেলেটির সঙ্গে আর কোনও অভিভাবক নেই কেন?

আমাদের পাণ্ডার নাম গিরিজা প্রসাদ। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এঁরা কারা?"

গিরিজা বাংলা বলতে পারে। সে বলল, "সাহেবলোগ এসেছে পিণ্ডি দিতে। ওই যে লেড়কা দেখছেন, ওটা হল সাহেবের দত্তক লেড়কা। ওই লেড়কা তার আগের মা-বাবার উদ্দেশে পিণ্ডি দিচ্ছে। সাহেবলোগ খুব খেয়ালি আদমি বাবুজি। সুরেন্দর মিশ্র ওদের পাণ্ডা। সেই আমাকে বলল পাঁচশো রুপেয়া মিলবে সুরেন্দর সিংয়ের।"

"সে কী! এরকমও হয় নাকি?"

পাণ্ডা বলল, "আগে তো কখনও দেখিনি। এই প্রথম আজব চিজ দেখলাম। সাহেবের ওই লেড়কা বাংলাভি জানে না, হিন্দিভি জানে না। ও-আর কী মন্তর পড়বে। মন্তর পড়ছে সুরেন্দরজি, আর ও শুধু ঘাড় নাড়ছে।"

ফল্গুতে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা গেলাম বিষ্ণু মন্দিরে। সেখানে থাকতে থাকতে দেখলাম ওই বিদেশী দম্পতি মন্দিরের বাইরে বসে। মুণ্ডিতমস্তক ছেলেটিকে নিয়ে পাণ্ডা মন্দিরে ঢুকছে। ছেলেটির রঙ কালো কিন্তু বেশ সুন্দর মুখশ্রী। স্বাস্থ্যও ভাল। গয়ায় কাজ মিটিয়ে আমি চলে গেলাম বোধি গয়া। সেখানে উঠলাম ট্যুরিস্ট লজে। বেশ ঝকঝকে নতুন দুটি বাড়ি পাশাপাশি। সামনে বিরাট লন। নীচের একটি ঘর আমার জন্য বুক্‌ড ছিল।

রাতে খাবার জন্য ডাইনিংহলে ঢুকেছি। দেখি, একটি টেবিলে বসে আর কেউ নয়, ফল্গুতীরে দেখা সেই বিদেশী দম্পতি আর তাঁদের ছেলেটি।

বিদেশী মানুষজন সম্পর্কে আমার অদম্য কৌতূহল। তা ছাড়া ফল্গুর তীরে ওঁদের দেখার পর থেকে ওঁদের সম্পর্কে জানবার জন্য আমি

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে,

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার
ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা
তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা
জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!
তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা
কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য
পাউডারের চেয়ে সার্ফই
বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড়
ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU-220-1810 BG

খুব উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম।

আমিই যেচে আলাপ করলাম, "শুভ সন্ধ্যা!" ভদ্রলোক সৌজন্যের খাতিরে বললেন, "শুভ সন্ধ্যা।"

আমি বললাম, "আমার নাম শ্যামল বসু। আপনাদের আজ দুপুরে গয়ায় দেখলাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনিও বুঝি গয়ায় গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমার বাবার পারলৌকিক কাজ করতে করতে ফল্গুনদীর ধারেই আপনাদের দেখলাম। ভাল কথা,আপনার নামটা জানা হল না তো!"

"আমার নাম উলরিখ হার্জ। আমার পত্নী নোরা, ছেলে ভিক্টর।"

নোরা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "হাই।" ছেলেটি তাকাল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। ছেলেটি এখন একটি জিনসের প্যান্টের সঙ্গে কাজ-করা লখনৌ পাঞ্জাবি পরেছে।

"আপনারা কোথাকার লোক?"

"সুইডেনের।"

"বড় চমৎকার দেশ। আপনি কোথায় থাকেন? স্টকহোমে?"

"না, একেবারে দক্ষিণে গটেবর্গ শহরে। আপনি?"

"আমার বাড়ি কলকাতায়। আমি একজন লেখক। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে এই টেবিলে আমার খাবার দিতে বলি।"

"নিশ্চয়ই। এটা খুবই আনন্দের যে একজন ভারতীয় লেখকের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ার সৌভাগ্য হবে।"

একটু পরে ডিনার এল। কথায় কথায় জানলাম, হার্জ দম্পতি আজ সকালে পাটনা থেকে গয়ায় পৌঁছেছেন। পাটনায় এসেছিলেন গতকাল। এই তাঁদের দ্বিতীয়বার গয়া সফর।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উলরিখ তাঁর স্ত্রী নোরাকে বললেন, "তুমি ভিক্টরকে নিয়ে ঘরে যাও। আমি একটু বাইরে বসছি মিঃ বসুর সঙ্গে। আমার ঘুম আসছে না।"

তারপর সুইডিশ ভাষায় ভিক্টরকে কী যেন বললেন। ভিক্টর ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

বাইরে বেতের চেয়ারে বসে নানান গল্প। উলরিখ পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর স্ত্রী ব্যাংকে চাকরি করেন। নিঃসন্তান ছিলেন বলে মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। বছর-দশেক আগে তিনি সুইডিশ অথরিটির কাছে আবেদন করেন, তিনি একটি বিদেশী ছেলে দত্তক নিতে চান। অথরিটি তাঁদের সম্পর্কে যথারীতি তদন্ত করে অনুমতি দেয়। তাঁরা ঠিক করেন একটি ভারতীয় শিশু দত্তক নেবেন। অনেক সুইডিশ পরিবার ভারতীয় শিশু দত্তক নিয়েছে। তাদের দু-একজনকে দেখেছেন। ভারতীয় শিশুরা খুব চালাক-চতুর হয়। নতুন জীবনের সঙ্গে তারা সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ভারতের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চিঠি লিখে যোগাযোগ করলেন উলরিখ। অনেক প্রতিষ্ঠানই চিঠির উত্তর দিল। বাচ্চাদের ছবি পাঠাল। শেষে একটি ছবি বেশ পছন্দ হয়ে গেল। ছেলেটির নাম মুন্না। বয়স আট মাস। পাটনা শহরের একটি মিশনারি প্রতিষ্ঠান লাইট অব ইণ্ডিয়ার অরফ্যানেজে মানুষ হচ্ছে। লাইট অব ইণ্ডিয়ার পরিচালিকা সিস্টার লীলা রঙ্গনাথন লিখেছেন, "লাইট অব ইণ্ডিয়া এ পর্যন্ত দেড়শো শিশুকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে। এইসব শিশুদের এখনকার ঠিকানা, শিকাগো, বাফালো, অসলো, স্টকহোম, ডসেলডর্ফ। আপনার জন্য আমাদের সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট শিশুটিকে রেখে দিচ্ছি।"

মাস কয়েক পরে পাটনার লাইট অব ইণ্ডিয়া অরফ্যানেজে এসে হাজির হলেন উলরিখ দম্পতি। মুন্নার পরিচয়পত্রটি দেখলেন। গয়া জেলার এক গরিব হরিজন-মায়ের ছেলে মুন্না। শিশুর বয়স যখন এক মাস তখন তাকে বোধি গয়ায় মহাবটবৃক্ষের তলায় ফেলে রেখে তার মা চলে যায়। শিশুর কান্না শুনে স্থানীয় লোকদের একজন তাকে বাড়ি দিয়ে আসে। সিস্টার লীলা রঙ্গনাথন তখন গয়াতে। খবর শুনে তিনি সেই বাড়িতে গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে শিশুটি অরফানেজে মানুষ হচ্ছে।

দত্তক নেবার জন্য যা নিয়ম-কানুন আছে সব পূর্ণ করে উলরিখ দম্পতি মুন্নাকে নিয়ে প্লেনে চাপলেন। পাটনা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে স্টকহোম। স্টকহোম থেকে গটেবার্গ।। সেখানে ওঁদের সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট।

আমি বললাম, "আচ্ছা মিঃ হার্জ, একটা কথার জবাব দেবেন? আপনার ছেলেকে দিয়ে

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-376

আপনি শ্রাদ্ধ করাচ্ছিলেন কেন? এটা কি তার আগের বাবা-মায়ের আত্মার কল্যাণের জন্য? কিন্তু এরই বা প্রয়োজন হল কেন? মুন্না তো আপনার ছেলে, তার নামও আলাদা। সে পুরোপুরি সুইডিশ এখন। তার চেহারা ভারতীয়। জ্ঞান হবার পর থেকে সুইডেনকেই তো সে নিজের দেশ বলে জানে। আর আপনি তো খ্রীস্টান মিঃ হার্জ, তাই না? পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি সাধন, জন্মান্তরবাদ এ সব কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

মিঃ হার্জ বললেন, "সে এক ইতিহাস মিঃ বসু। অন্য কোন লোক আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আপনি লেখক, আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি সুপারন্যাচারালে বিশ্বাস করেন মিঃ বসু?"

আমি বললাম, "না; কেন বলুন তো?"

হার্জ বললেন, "আমিও করতাম না। আমি খ্রীস্টান এবং একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী খ্রীস্টান। কিন্তু আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানের ছাত্র, কোনোদিন ভূত-প্রেত, বিদেহী আত্মায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমার জীবনে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে গত দশ বছর ধরে। এই দশ বছর কখনোই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। যেন একটা বিরাট অভিশাপের বোঝা আমি বহন করে নিয়ে চলেছি। এ-কথা কাউকে বলিনি। আপনি যখন কথাটা তুললেন তখন আপনাকেই বলছি মিঃ বসু।"

উলরিখ হার্জ বলতে শুরু করলেন, "মুন্নাকে গটেবর্গে নিয়ে গিয়ে আমরা ওর নামকরণ করলাম ভিক্টর। আমাদের চোখের সামনে ভিক্টর বড় হয়ে উঠতে লাগল। খুবই প্রাণবন্ত আর বুদ্ধিমান ছেলেটি।

"ওর যখন এক বছর বয়স তখন ঘটল ঘটনাটি। ওর প্রথম জন্মদিন আমরা পালন করলাম খুব ঘটা করে। নর্থ সীর ধারে একটি ভিলা ভাড়া করা হল। বন্ধুবান্ধবরা খুব হৈ-চৈ করলেন সারাদিন। রাতে খাওয়া, বলনাচ। একটা হল-ঘরে চলছিল নাচ। কত রাত হয়েছে, খেয়াল করতে পারিনি। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে ভিক্টর, মাঝে মাঝে নোরা গিয়ে ওকে দেখে আসছে। হঠাৎ নোরার তীব্র আর্তনাদে আমরা নাচ থামিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। দেখি থর-থর করে কাঁপছে নোরা। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে নোরা? কী হয়েছে? নোরা বলল, ময়লা একটা শাড়ি-পরা কালো চেহারার এক ভারতীয় স্ত্রীলোককে সে ভিক্টরের শিয়রে বসে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে।

"তার আর্তনাদ শুনে স্ত্রীলোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা আশেপাশের সব জায়গা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও কোনো লোককে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, নোরার চোখের ভুল।

"কিন্তু ওটা যে নোরার চোখের ভুল নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ভিক্টরের দ্বিতীয় জন্মদিনে। সেবার আমরা গটেবর্গের বাড়িতেই জন্মদিনের আয়োজন করেছিলাম। জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। তখন রাত বারোটা। হঠাৎ দরজায় কলিং বেল। এত রাতে কে এল? আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। নোরা তার আগেই উঠে গেছে। দরজার ল্যাচ-কী দিয়ে নোরা দেখল কেউ নেই। তাহলে কি বেল শোনার শব্দই ভুল? নোরা তবু নিশ্চিত হবার জন্য দরজা খুলল। আর খুলেই যা দেখল তাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল সে।

"জ্ঞান হলে নোরা বলেছিল, দরজা খুলতেই সে দেখতে পায় ময়লা শাড়ি-পরা কালো রঙের সেই ভারতীয় স্ত্রীলোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর নোরার আর কিছু মনে নেই।

"এরপর থেকে গত সাত বছর ধরে প্রতিটি জন্মদিনেই ঘটেছে এই ঘটনাটি। চতুর্থবারের পর আমরা প্রস্তুত হয়েই থাকতাম ওই মূর্তিটিকে দেখার জন্য। শুধু যে নোরা ছায়ামূর্তিকে দেখেছে তা নয়, আমিও দেখেছি। খুব স্পষ্ট, এই যেমন আপনাকে দেখছি।"

"মূর্তিটি কি কথা বলে?"

"না। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু কোনো কথা তার মুখ থেকে শুনিনি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড মূর্তিটিকে দেখা যায়। তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার যদি ফিরে আসে তাহলেও তা স্থায়ী কয়েক সেকেণ্ড। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ওই ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, ভিক্টরের মা।

"ষষ্ঠ জন্মদিনের পর থেকে ভিক্টরের জন্মদিন পালন করা আমরা ছেড়ে দিলাম। জন্মদিন গটেবর্গের বাইরে কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। চলে গেলাম লণ্ডনে। ওর সপ্তম

জন্মদিনের দিন আমরা রিজেন্ট পার্কে সারা দিন শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। আমি আর নোরা গল্প করছিলাম। ভিক্টর বল নিয়ে খেলছিল। হঠাৎ দেখি ভিক্টর নেই। তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখি ভিক্টরের হাত ধরে একটি শাড়ি-পরা স্ত্রীলোক হন-হন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি ভিক্টরের কাছে গিয়ে ভিক্টরকে স্পর্শ করলাম। এক নিমেষে স্ত্রীলোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল আর সংজ্ঞা হারিয়ে সবুজ ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল ভিক্টর।

"অবশেষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি বই পড়ে জানলাম, ভারতীয়রা আত্মার মুক্তিতে বিশ্বাস করে। গয়ায় পিণ্ড দিলে নাকি বিদেহী আত্মা সন্তুষ্ট হয়। তাদের মোক্ষলাভ হয়। মাটির মায়া আর তাদের বাঁধতে পারে না। আমরা ঠিক করলাম ভিক্টরকে দিয়ে তার অজানা মায়ের উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়াব। নয়তো এই আতঙ্ক, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা আমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। প্রতিবার জন্মদিন এগিয়ে আসতে থাকলে আমরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠি। এর সমাধান চাই। আমরা আর পারছি না। তা ছাড়া ভিক্টরের মনে অন্য প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে, সে কে? তার আসল মা কে?"

"এই জন্যেই গয়ায় আসা?"

"ঠিক তাই। নয়তো এত টাকা খরচ করে বারবার ভারতে আসার মতো অবস্থা আমাদের নয়।"

"আপনার কী মনে হয়?"

"আগামী কাল না গেলে বুঝতে পারব না। মন্ত্র, বিশ্বাস এগুলোর একটা শক্তি আছে। অলৌকিক ঘটনাকে যদি চোখে দেখতে পারি তাহলে মন্ত্রশক্তির ওপর আস্থা থাকবে না কেন?"

"ভিক্টরের পরবর্তী জন্মদিন কবে?"

উলরিখ বললেন, "কাল।"

"আগামী কাল?"

"হ্যাঁ মিঃ বসু, এই অষ্টম জন্মদিনটি আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পিণ্ডদানের ফলে ভিক্টরের মায়ের আত্মার যদি মুক্তিই হয় তবে ভিক্টরের অষ্টম জন্মদিনটি নির্বিঘ্নে কাটবে। আর এই জন্মদিন নির্বিঘ্নে কাটলে বুঝব আর আমাদের ভয় নেই। আমাদের সমস্ত বিপদ কেটে গেছে।"

আর মাত্র একটা দিন, তাও থাকতে পারলাম না। কাল সকালেই আমাকে রাজগির যেতে হবে।

আর দুদিন পরে রাজগিরে বসেই পড়লাম সেই ঘটনাটি। উলরিখ হার্জ এক আদিবাসী মহিলাকে খুন করেছেন। হ্যাঁ, দিনটি ভিক্টরের অষ্টম জন্মদিন।

কিন্তু, এই জন্মদিনে ভিক্টরের সন্তানহারা মা কি তার ছেলের কাছে আসতে পেরেছিল? না কি সে যাত্রা করেছিল আর এক মোক্ষলোকে? তাই যদি হয়, উলরিখ যাকে খুন করেছিল সে কে? কত হাজার হাজার ভিখারিই তো ভারতের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাউকে তিনি সেই স্ত্রীলোক বলে ভুল করেছিলেন। তারপর গর্জে উঠেছিল তাঁর রিভলভার।

ফল্গু নদীর ধারে বিদেহী আত্মার মুক্তিমন্ত্রে তিনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেননি। দেখা হলে এ-সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতাম উলরিখের কাছ থেকে। কিন্তু না, গয়া জেলে এক খুনের আসামী বিদেশীর সঙ্গে দেখা করে সব প্রশ্নের জবাব নেওয়া আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

এথেন্সের রাজপথ। গ্রীক দার্শনিক ডিওজিনিস একদিন সকালে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে যে যাচ্ছে—তারই মুখের কাছে লণ্ঠনটা তুলছেন আর কী যেন খুঁজছেন। এমনিতেই সকলে পাগল বলত। বলবারই কথা। খটখটে রোদে কি কেউ লণ্ঠন জ্বেলে ঘুরে বেড়ায়? সারাটা দিন এইভাবেই কেটে গেল। একের পর এক পথচারীকে দেখে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরছেন, এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করলেন, "কী খুঁজছিলেন সারাদিন ধরে? বিমর্ষ মুখে উত্তর দিলেন দার্শনিক, "সারাদিন ধরে একটা মানুষ খুঁজছিলাম, কিন্তু পেলাম না।

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩৯ ॥

সব দিক বিবেচনা করে যখন ঠিক হল যে এলগিন রোডের বাড়ি থেকেই যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে, রাঙাকাকাবাবু নতুন করে চিন্তা আরম্ভ করলেন। তবে ঠিক কী উপায়ে বাড়ি থেকে লুকিয়ে যাওয়া হবে সে-বিষয়ে কিছুদিন তিনি পরিষ্কার করে বললেন না। অন্য অনেক ব্যবস্থা করার ছিল, সেগুলি নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রথমত একটা ছদ্মবেশ তো চাই। সেজন্য নিজের কী কাপড়জামা আছে দেখতে চাইলেন। তাঁর গরম কাপড়জামা, বিশেষ করে যেগুলি তিনি আগে ইউরোপে ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে মার কাছে থাকত। তিনি সকলকে বললেন যে, অনেকদিনের জন্য তো তিনি শীঘ্রই জেলে চলে যাবেন, তাঁর কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র কোথায় কী আছে দেখে নিতে চান। আমি মাকে বলে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তাঁর যা-কিছু ছিল, তাঁরই পরিচারক রমণীকে দিয়ে এলগিন রোডের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু জামাকাপড় তিনি ফেরতও দিলেন, তার মধ্যে কিছু ছিল যা আমাকে সঙ্গে নিতে হবে। অন্তর্ধানের পর রাঙাকাকাবাবুর কাপড়চোপড় নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করাটা বাড়ির কারুর কারুর মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল।

এরই মধ্যে বেশ একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ঘটল। রাঙাকাকাবাবু দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর অনুগামীদের একটা মীটিং ডাকলেন। মীটিংটা উপলক্ষ মাত্র, আসল কাজটা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যায় রাঙাকাকাবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি একজন পাঠান ভদ্রলোক রয়েছেন। বাড়ির দু-একজনও ছিলেন—আর ছিলেন রাঙাকাকাবাবুর সেক্রেটারি অমূল্য মুখার্জি। আমাকে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, সেই সন্ধ্যায়ই মিঞাসাহেব ফিরবেন। তাঁর রেলের টিকেট কাটা ও বার্থ রিজার্ভ করা হয়নি, সেজন্য অমূল্যবাবুকে তিনি আগেই হাওড়া স্টেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমি যেন ওয়াণ্ডারার গাড়িতে করে তাঁকে সময়মতো স্টেশনে পৌঁছে দিই। পথে তিনি হোটেল থেকে তাঁর মালপত্র তুলে নেবেন এবং ধর্মতলায় কিছু কেনাকাটা আছে—তাও সেরে নেবেন। নজর করলাম, রাঙাকাকাবাবুর খাটে একটা মাপবার ফিতে পড়ে ছিল।

গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার, মিঞা আকবর শাহ ও আমি বসে ছিলাম পিছনের সীটে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মিঞাসাহেব ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, রাঙাকাকাবাবু তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের ব্যাপারে এদিককার ভার আমার উপর পড়েছে, অন্য প্রান্তের ভার তাঁর নিজের উপর। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে তিনি একটা সিগন্যাল পাঠাবেন। প্রথমে মির্জাপুর স্ট্রীটের এক হোটেল থেকে তাঁর মালপত্র তুলে নিলেন। তারপর বললেন ধর্মতলা স্ট্রীটে ওয়াছেল মোল্লার দোকানে নিয়ে যেতে, সেখান থেকে তিনি রাঙাকাকাবাবুর জন্য দু-একটা জিনিস কিনে দেবেন। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হল, তিনি স্টেশনে নামবার সময় ইচ্ছা করে জিনিসগুলো ভুলে গাড়িতে ফেলে যাবেন। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে আমরা একসঙ্গেই ঢুকলাম, জিনিস কিনবার জায়গাটা তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে আমি দূরে সরে রইলাম। দেখলাম মিঞাসাহেব পায়জামা টুপি নিজের গায়ে লাগিয়ে দেখছেন। যেন নিজের জন্যই কিনছেন। রাঙাকাকাবাবুর জন্য তিনি একজোড়া ঢিলে পায়জামা ও একটি ফেজ ধরনের লোমশ 'আস্ট্রাখান' টুপি কিনলেন। তিনিই প্যাকেটটি হাতে করে গাড়িতে উঠলেন, সীটের পেছনে সেটা ফেলে রাখলেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই দেখলাম,

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার

ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই

ভারী মজার! এই একটা উপহার
আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে।
ইউকোব্যাঙ্ক পাস বইয়ের মজাই তো
ঐখানে!

ভাগ্যিস্, মা'র মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল।
অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ
দিই—আমার জমা পয়সা বছর
বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-69/80 BEN

অমূল্যবাবু স্টেশনের গাড়িবারান্দায় অপেক্ষা করছেন। রাঙাকাকাবাবু আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন স্টেশনে না নামি। চট করে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে আমি মিঞাসাহেবকে বিদায় জানিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, বাড়ি চলুন। কিন্তু কী মুশকিল, স্টেশনের চত্বর ছাড়বার আগেই ড্রাইভার বাবুর নজরে পড়ল, মিঞাসাহেব প্যাকেটটি ফেলে গেছেন। আমাকে বলল, "দৌড়ে দিয়ে আসব নাকি?" আমি বিরক্তির ভান করে বললাম, "অত হ্যাঙ্গাম আমার পোষাবে না, ভুলে গেছেন তো আমি কী করব, পরে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিলেই হবে। তাড়া আছে, বাড়ি চলুন।" বাড়ি ফিরে প্যাকেটটি আমার আলমারিতে বন্ধ করলাম।

মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে কথাবার্তা ও বাজার করবার পর আমি পরিষ্কার বুঝে গেলাম যে, রাঙাকাকাবাবু অসাধারণ বৈপ্লবিক কিছু করতে বিদেশে পাড়ি দেবেন। পরে আমাকে বললেন, আমাকেও বেশ কিছু কেনাকেটা করতে হবে। নিউ মার্কেট থেকে এক জোড়া ফ্যানেলের শার্ট ও 'মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড' মার্কা চিরুনি, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান ইত্যাদি কিনেছিলাম মনে আছে। মজবুত মোটা ধরনের এক জোড়া কাবলি জুতো কিনতে খুব অসুবিধায় পড়েছিলাম। শেষপর্যন্ত মোটামুটি পছন্দসই একজোড়া পেয়েছিলাম। হ্যারিসন রোডের একটা বড় দোকান থেকে একটা মাঝারি মাপের সুটকেশ, একটা অ্যাটাচি কেস ও বিছানার জন্য একটা হোল্ডল কিনলাম। রাঙাকাকাবাবুর কথামতো বাক্সগুলির উপরে কালো কালি দিয়ে M.Z. লিখিয়ে নিয়েছিলাম। ছোট তোশক, বালিশ ইত্যাদি ধর্মতলা স্ট্রীটের একটা দোকান থেকে যোগাড় করলাম। একটা সুবিধা ছিল যে, যখন আমি বাক্সপ্যাঁটরা বিছানা ইত্যাদি কিনছিলাম, উডবার্ন পার্কের বাড়ি তখন খালি। বাড়ির চাকরবাকরেরা যাতে এসব কিছু না দেখে ফেলে সেজন্য দুপুরবেলা যখন ড্রাইভাররা ছুটি নেয় আর অন্যেরা বিশ্রাম করে সেই সময় নিজে গাড়ি চালিয়ে বড়সড় জিনিসগুলো সংগ্রহ করেছিলাম। নীচের তলার বেয়ারাটি দুপুরে খাওয়ার পরে সামনের বারান্দায় কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা যেত। তাকে পাশ কাটিয়ে চুপিসারে সব জিনিসপত্র আমি

মিঞা আকবর শাহ

তিনতলায় নিজের ঘরে নিয়ে ফেললাম। বেশ কিছু আলমারির ভিতরে গেল। বড় বাক্সটি রইল অন্য বাক্সের সঙ্গে খাটের তলায়।

রাঙাকাকাবাবুর জন্য একটা ভুয়ো ভিজিটিং কার্ড ছাপাতে হবে। এক টুকরো কাগজে পেন্সিলে বড় বড় অক্ষরে যেমন ছাপাতে হবে লিখে দিলেন। বললেন, সম্পূর্ণ অজানা দোকানে যেতে হবে এবং আমার পোশাক চালচলন এমন হওয়া চাই যে, মনে হবে আমি নিজের জন্যই কার্ড ছাপাচ্ছি। নিজের হাতে রাঙাকাকাবাবুর লেখাটা কপি

করে নিয়ে এক সন্ধ্যায় স্যুট-টাই ইত্যাদি চাপিয়ে হ্যাট হাতে নিয়ে তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। সদর দরজা পেরোতেই ডাঁটিদাদার (রবীন্দ্রকুমার ঘোষ) মুখোমুখি হয়ে গেলাম। তিনি তো ঐ পোশাকে আমাকে কখনও দেখেননি, বাবা তো পাহাড়ে পরবার জন্য ওগুলি করিয়ে দিয়েছিলেন। কী যে করি! যাই হোক, সরলপ্রাণ ডাঁটিদা নিজেই বলে উঠলেন, "বাইরে ডিনার-টিনার আছে বুঝি?" আমতা-আমতা করে আমি বললাম, "এই, মানে, হ্যাঁ, একটা, মানে ডিনার···!" ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলাম রাইটার্স বিল্‌ডিং-এর পেছনে রাধাবাজারে। যতটা পারি গম্ভীর মেজাজে টানা টানা ইংরেজিতে কার্ডটা অর্ডার দিলাম :

MOHD. ZIAUDDIN B.A., Ll.B.
Travelling Inspector
The Empire of India Life Insurance Co. Ltd.
Permanent address :
Civil Lines,
Jubbulpore.

পরে কার্ড যখন রাঙাকাকাবাবুর হাতে দিলাম, তাঁর তো পছন্দ হয়েছে বলেই মনে হল।

উডবার্ন পার্কে তো দুটো গাড়ি—একটা বড় স্টুডিবেকার প্রেসিডেন্ট যেটা বাবা ব্যবহার করতেন। আর অন্যটা ওয়াণ্ডারার। একদিন রাঙাকাকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ গাড়িটা আসল কাজের জন্য নেওয়া হবে। স্টুডিবেকার খুব জোরদার গাড়ি। চলে খুব ভাল, চালাতেও আরাম। ওয়াণ্ডারার গাড়িটাও ভাল, সব জার্মান জিনিসই যেমন হয়, তবে লম্বা পাড়িতে গোলমাল করবে না তো? মনে হল রাঙাকাকাবাবু প্রথমটায় স্টুডিবেকারের পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম, বড় গাড়িটা বড়ই চেনা, রাস্তায় দেখলে অনেকেই বলে ওঠে, ঐ যে শরৎ বোসের গাড়ি বা ঐ যে শরৎ বোস যাচ্ছেন। সুতরাং ওয়াণ্ডারার নেওয়াই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল।

একদিন রাঙাকাকাবাবু আমার ও গাড়ির একসঙ্গে পরীক্ষা নিলেন। বললেন, "সকাল-সকাল বেরিয়ে ওয়াণ্ডারার গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় কোথাও না থেমে তুমি বর্ধমান চলে যাও। বর্ধমান রেল-স্টেশনে দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে আবার সোজা চলে এসো। এসেই আমাকে বলো, গাড়ি কেমন চলল, তোমারই বা কতটা ক্লান্তি হল।" ফিরে আমি ভাল রিপোর্টই দিলাম। আর-একদিন বললেন, "রিষড়ার বাড়ির লোকটিকে একটু প্রস্তুত করে রাখা যাক, বাড়ির লোকেরাও জানুক যে তুমি কখন কখন রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকো।" এক সন্ধ্যায় রিষড়ায় চলে যেতে বললেন। আমি একটু দেরি করে রিষড়ায় পৌঁছে মালিকে বললাম, "আজ রাত হয়ে গেছে, আমি এখানেই থেকে যাব, বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করে দাও, কিছু খাবার নিয়ে এসো।" রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন, তাঁকে আরও দূরের কোনো স্টেশনে তুলে দিয়ে ফেরবার সময় আমাকে রিষড়ায় থেকে যেতে হতে পারে। লোককে বলারও সুবিধে হবে যে আমি রিষড়ার বাগানবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। (ক্রমশ)

১৯২৫ সালে আসামে কালাজ্বরে মারা গিয়েছিল ৬৩৬৫ জন, আর ১৯৬৫ সালে মারা গেল ৮৪৫ জন। চল্লিশ বছরে মৃত্যুর হার এত কমে গেল কী করে? এটা সম্ভব হল একজনের একক প্রচেষ্টায়, তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ক্যাম্‌বেল মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। হাসপাতালের আর নিজস্ব রুগি দেখে সারাটা দিন কেটে যেত। রাত্রেই শুধু গবেষণা করবার সময়। দামি যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ্য নেই, সামান্য জিনিসপত্র দিয়ে কাজ করে যেতে লাগলেন তিনি রাতের পর রাত। ফল, প্রথমে আবিষ্কার সোডিয়াম অ্যান্টিমনিল টারটারেট, তার পরে আরও কার্যকরী ইউরিয়া স্টিবামনিল। কালাজ্বরের চিকিৎসায় যুগান্তর নিয়ে এল এই ওষুধ।

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : গবা কি সত্যি পাগল ? উদ্ধবের কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর নতুন গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খায়। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হয়। খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত, পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সে গা ঢাকা দেয়। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পাবার পরে গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধবের বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলকে দলে টেনে ইতিমধ্যে কাকাতুয়ার সঙ্গে রামুকেও লুঠ করেছে সাতনা। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যরাতে গবা যায় কাশিমের চরে। সেখানে সাংকেতিক গান গেয়ে ডাকাতদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে, তারপর মরতে-মরতে ফিরে আসে। নয়নকাজল অনুতপ্ত। ওদিকে গোবিন্দকে যুধিষ্ঠির জানায়, সে নিহত হরিহরের ছেলে। এদিকে রামুর পরামর্শে পালাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নয়নকাজল হঠাৎ এক ডাকাতের নজরে পড়ে গিয়ে থাপ্পড় খায়। তারপর ···

॥ ২৬ ॥

যখন একটু ধাতস্থ হল নয়নকাজল, তখন আবার আত্মারামের খাঁচা ছাড়ার উপক্রম। লোকটা তার কণ্ঠার কাছে বল্লমের চোখা ডগাটা ধরে আছে। যা ধার, তাতে একটু চাপ দিলেই গলা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে। নয়নের বুক ঢিবঢিব করছে, মা-কালীর নামটাও স্মরণে আসছে না।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "তোর নাম কী ?"

নয়নকাজল জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "ইয়ে মানে—"

সর্বনাশ ! নয়নকাজল দেখে নিজের নামটাও তার মনে নেই মোটেই। মাথাটা এত ধেবড়ে গেছে যে, কোনও-কিছু স্পষ্ট মনে পড়ছে না। বাবার নামও নয়, নিজের নামও নয়, কারো নামই নয়। তবে উপায় ?

"কী রে ?" বলে লোকটা বল্লমটা একটু নাড়ে।

নয়নকাজল চেঁচিয়ে বলে, "আমার নাম লোক।"

"লোক ?" বলে লোকটা অবাক হয়ে পড়ে থাকা নয়নকাজলের দিকে চেয়ে বলে, "লোক আবার কারো নাম হয় নাকি ?"

"কে জানে বাপু। নিজের নামটা আমার মনে পড়ছে না তেমন। মেলা খোঁচাখুঁচি কোরো না, লেগে যাবে।"

"এখানে কী করিস ?"

"ডাকাতি। আর কী করার আছে ?"

"তুই কেমনধারা ডাকাত ? আমার মতো রোগাপটকা লোকের একটা চড় সহ্য করতে পারিস না ! কোন্ আহাম্মক তোকে দলে ভিড়িয়েছে ?"

এ-কথায় নয়নের খুব অপমান বোধ হল। লোকটা তেমন রোগাপটকা মোটেই নয়। দিব্যি ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। হাতে চড়টাও বেশ খোলতাই হয়। নয়ন বলল, "চড়-টড় খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।"

লোকটা হাসল। বলল, "তা দড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলি ? গলায় দড়ি দিতে ?"

দড়ির কথায় নয়নের গোটা ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তাই তো ! রামু যে হাঁ করে বসে আছে তার জন্য। আর তো দেরি করা যায় না।

নিজের অবস্থাটা আড়চোখে একটু দেখে নিল নয়ন। খুবই খারাপ অবস্থা। ছাদের ধুলোবালির মধ্যে চিত হয়ে পড়ে আছে সে। তার বুকের দুদিকে দুখানা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাতের বল্লম তার গলায় ঠেকানো। নড়ার সাধ্য নেই।

নয়ন বলল, "তা গলায় দড়ি দিলেই বা কী ? তোমার বল্লমের চেয়ে সেটা কতটা খারাপ হবে ?"

"মতলবটা কী ফেঁদেছিলি সেটা খোলসা করে বল তো বাপ। নইলে গেলি।"

নয়ন লক্ষ করছিল, লোকটা তাকে মানুষ বলেই তেমন গ্রাহ্য করছে না। ভাবছে নয়নের

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

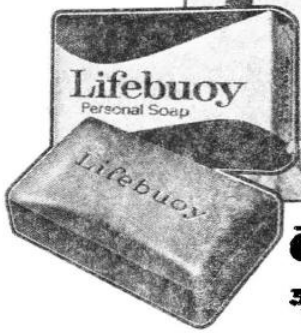

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সিনটোস-LP.10-1012 BG

পিপড়ের প্রাণ, তাই ততটা সাবধানও হচ্ছে না। নয়ন নিজের ডান পা'টা একটু তুলল। না, লোকটা লক্ষ করছে না। পা তোলার ঘটনাটা ঘটছে লোকটার পিছন দিকে। সুতরাং নয়ন লোকটাকে পিছন থেকে একটা রাম লাথি কষাতে পারে। ভয় হল, সেই ধাক্কায় লোকটার বল্লম না আবার তার গলায় বিঁধে যায়। তাই লাথি মারার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের মটকায় বল্লমটা সরিয়ে দিতে হবে। তারপর মা-কালী ভরসা। নয়ন লোকটাকে অন্যমনস্ক করার জন্য হঠাৎ একটু ককিয়ে উঠে বলল, "আমার পেটে বড় ব্যথা। বল্লমটা সরাও।"

লোকটা আবার তার নাটুকে হাসি হেসে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা আর হল না। নয়নের আচমকা লাথিটা লোকটাকে দুহাত ছিটকে দিল। হুড়মুড় করে লোকটা যেই পড়েছে অমনি নয়ন বল্লমটা বাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুনটুন সে জীবনে করেনি। তাই বল্লমটা লাঠির মতো বাগিয়ে ইচ্ছেমতো ঘা কতক দিল লোকটাকে। লোকটা নেতিয়ে পড়ে রইল চুপচাপ।

নয়নকাজল দড়ি নিয়ে ছাদের একটা মজবুত রেলিং-এ বেঁধে খানিকটা নিজের কোমরে জড়াল। এখন আর তার আলসে দিয়ে নামতে ভয় করছে না। তার চেয়ে বড় ভয় ওই লোকটার যদি চট করে জ্ঞান ফিরে আসে।

দড়ি ধরে একটু ঝুঁকতেই রামুর ঘরের ঘুলঘুলিটা হাতের নাগালে পেয়ে গেল সে। দড়িটা নামিয়ে দিয়ে ডাকল, "রামু!"

"এই যে!"

"উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি। বাইরে বিপদ।"

রামু গোবিন্দর কাছে কায়দা-কসরত কিছু কম শেখেনি কদিনে। দড়ি ধরে টপ করে ঝুল খেয়ে উঠে এল ঘুলঘুলিতে। তারপর দড়িটা টেনে নিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে নেমে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না।

সে যে পালাতে পারে, এটা নিশ্চয়ই কারো মাথায় আসেনি। এলে আরো ভাল পাহারা রাখত। কিন্তু পাহারা নেই। তা বলে পালানোও সহজ নয়। চারদিকে ঘন গাছপালা। নিবিড় জঙ্গল। তারা রাস্তা চেনে না।

"নয়নদা, কোন্‌দিকে যাবে?"

"তাই তো ভাবছি। চলো এগোই যেদিকে হোক। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।"

"চলো।" বলে রামু এগোতে থাকে।

কিন্তু এগোনো খুবই শক্ত। শীতকাল বলে সাপের ভয় নেই তেমন। কিন্তু লতাপাতায় পা আটকে যায়। হঠাৎ-হঠাৎ পাখি ডেকে ওঠে।

দুর্গের মতো বিশাল বাড়িটার চৌহদ্দি বড় কমও নয়। খানিকদূর এগোনোর পর সামনে আর-একটা ভাঙা দালান। সেই দালানের একটা ঘর থেকে টেমির আলো আসছে বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে।

নয়ন রামুর হাত চেপে ধরে বলল, "সর্বনাশ! শিগ্‌গির অন্য পথে চলো।"

রামু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "যাব, একটু উঁকি দিয়ে যাই।"

"পাগল হয়েছ?"

হঠাৎ কাছে-পিঠে একটা ঘোড়া পা দাপিয়ে চিহিঁহি করে ডেকে উঠল। দুজনেই সেই শব্দে চমকে ওঠে।

"রামু, লক্ষণ ভাল নয়।"

"তুমি চুপ করো তো নয়নদা। অত ঘাবড়ে যাও কেন?"

রামু নিঃসাড়ে গিয়ে জানালার ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়ে তার রক্ত জল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একটা চৌকির ওপর কম্বলের আসনে বিশাল চেহারার এক কাপালিক বসা। তার মস্ত জটাজুট, বিশাল কালো দাড়ি-গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ধ্যাবড়া টিপ। গায়ে লাল পোশাক। তার সামনে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে সাতনা।

নয়ন ডাকল, "রামু! পালাও!"

রামু আর দাঁড়াল না, নয়ন আর সে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

কতবার যে পড়ল দুজন, কতবার ফের উঠল, তার হিসেব নেই। গাছের সঙ্গে শতেক-বার ধাক্কা খেল। পা-হাত ছড়ে গেল, কপাল ফুলে উঠল। তবু তারা দৌড়তে থাকে।

খানিকটা দূর দৌড়োবার পরই তারা বুঝতে পারে, পিছনে কারো হাঁকডাক নেই বটে, কিন্তু কেউ তাদের পিছু নিয়েছে ঠিকই। তারা যেদিকে যাচ্ছে, পায়ের একটা শব্দও সেদিকেই তাদের পিছু নিচ্ছে।

"নয়নদা, পিছনে কেউ আসছে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

(ক্রমশ)

সুজয়ের জাদুঘর

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কুল থেকে অনেকক্ষণ ফিরেছে সুজয়। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। তার মা খাবার নিয়ে ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলেন না। বেশ রাগ করলেন মা, নিশ্চয়ই জাদুঘরে ঢুকেছে, এই এক অভ্যেস হয়েছে ছেলের, একটু ফাঁক পেলেই জাদুঘরে ঢোকা।

বাড়ির মধ্যে জাদুঘর, কেমন একটু আশ্চর্য না? সুজয় পড়াশুনোতে ফাঁকি দেয় না। ক্লাস ফাইভ থেকে সিকসে উঠেছে রীতিমত ভাল নম্বর পেয়ে। কিন্তু ও একটু অন্যরকম। ওই বয়সের ছেলেদের সঙ্গে ভাবনা-চিন্তায় কোথায় যেন ওর অমিল।

সুজয়দের কলেজ স্ট্রীটের বাড়িটা বেশ বড়-সড়। একতলায়-দোতলায় অনেক ঘর। অনেক জায়গা। তিনতলার বিরাট ছাতটাও বেশ সুন্দর। একা-একা খেলতেও সুজয়ের ভারি ভাল লাগে। সব চেয়ে ভাল লাগে দোতলার কোণের ঘরখানি। হ্যাঁ, ঘরখানা একটু অন্ধকার, হাওয়া তেমন খেলে না। আর সেইটেই তো সুজয়ের লাভ। ঘরটা ভাল নয় বলে কেউ ব্যবহার করে না। সুজয় এই ঘরটাকেই মনের মতো করে সাজিয়েছে।

ঘরের জিনিসগুলো এমনই যে, যে দেখে সেই হাসে। কেউ আবার সুজয়কে রাগাতেও ছাড়ে না। "ওই বটগাছের ডালটাকে টবে বসিয়েছিস কেন রে? টবে কখনও বটগাছ হয়?" "এগুলো তো রেললাইনের পাথর, জড় করে লাভ কী? চিনেমাটির ভাঙা প্লেটগুলো সাজিয়ে রাখার মানে?"

আগে সুজয় রেগে যেত। এখন রাগে না। ওর জাদুঘর এখন জমজমাট। যে আসে সেই দেখে যায়। অনেকে আবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। নানা প্রশ্ন করে। সেজমামা সেদিন বললেন, "ছেলেটা একটু অন্যরকম রে। ও ঠিক ঝাঁকের কই নয়।" সুজয় কথাটার মানে বুঝতে পারল না, কিন্তু এটা ধরতে পারল যে, সেজমামা বেশ খুশি হয়েছেন।

সুজয়ের ছোটকাকু বিলেতে থাকেন, ছবি আঁকেন। জাদুঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে সুজয়ের নিজের হাতে আঁকা ছবি। খুব প্রশংসা করলেন ছোটকাকু। এত সুন্দর ছবি এইটুকু ছেলের আঁকা, দেখে বিশ্বাসই হয় না।

সুজয়ও খুশি। তবে দুঃখও হল। তার নীল টবের ঝিকমিক বালিগুলো তো ছোটকাকু দেখেও দেখলেন না! ও কত কষ্ট করে পুরীর সমুদ্রের বালি ব্যাগে ভরে বয়ে এনেছে। আনা কি সোজা কথা। বালি আনতে দেখে বাবা এত রেগে গেলেন যে, ওর সঙ্গে কথাই বললেন না। মা অসন্তুষ্ট, এত দূর থেকে এক বস্তা বালি বয়ে নিয়ে যেতে হবে!

সুজয় তবু ছাড়েনি। বালি বয়ে এনেছে। এখন নীল টবে সেই বালি! এ কি যে সে বালি, এ হল সমুদ্রের বালি! ওই টবের কাছে গেলেই

সুজয় সমুদ্রের গন্ধ পায়। আর, এত ভাল লাগে!

পুরীর একেবারে শেষপ্রান্তে লোকনাথের মন্দির। মা সেখানে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সুজয় লক্ষ করল, জঙ্গলের গাছগুলো সব একরকম দেখতে। এগুলো কী গাছ? রিকশাওয়ালা জানাল, এ-গাছ কখনও মরে না। মাটিতে একটুখানি ডাল ফেলে রাখলেই নিজে থেকে হবে। রোদ জল কিছু দাও আর না দাও।

শুনেই সুজয়ের গাছের জন্য সে কী বায়না। বাবা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মা বললেন, "ফল নেই, ফুল নেই, পাতাগুলো পর্যন্ত বিচ্ছিরি। ও-গাছ নিয়ে কী হবে?"

রিকশাওয়ালাটা ভাল। কেমন হাসিমুখে মস্ত দুটো ডাল ভেঙে সুজয়ের হাতে দিল। মা বললেন, "আর যদি তোমায় কখনও বেড়াতে নিয়ে আসি! ভাল কিছু কেনাকাটির নাম নেই, যত রাজ্যের জঞ্জাল নিয়ে টানাটানি!"

গোল-পাতা ক্যাকটাস নেবারও ইচ্ছে ছিল সুজয়ের। কিন্তু ভয়ে চুপ করে ছিল। আনা হয়নি। এখন এত আফসোস হয়!

সেই গাছ দেখে বাড়ির সবার সে কী হাসি! একটা বিচ্ছিরি বুনো-গাছ অত দূর থেকে আনার কোনও মানে হয়। সুজয় চুপ করে ছিল।

জল, রোদ্দুর না পেলেও গাছটা মরবে না, কী আশ্চর্য না! সুজয় কিন্তু রোজই একটু করে জল দেয়। এমনকী টবটাকে মাঝে-মাঝে রোদ্দুরেও রেখে আসে। ভাবে, আহা, রোদ-জল ছাড়া ও না-হয় বেঁচে থাকে, তা বলে কি কষ্ট হয় না? কোথায় কতদূরের গা-ছম-ছম সেই লোকনাথের জঙ্গলের গাছ। এখন জাদুঘরের জানলায়। সুজয়ের শরীরে রোমাঞ্চ হয়। সে গাছের পাতায় হাত রাখে।

অন্যদিন স্কুল থেকে এসে সুজয় আগে মায়ের কাছে যায়। তারপর খেয়ে-দেয়ে জাদুঘরে কিছুক্ষণ থাকে। বন্ধুরা ডাকতে এলে খেলতে যায়। আজ সে মায়ের কাছে না গিয়েই জাদুঘরে চলে এসেছে। তার একটা কারণ আছে অবশ্য। বাড়ি ফেরার সময় একটা রুপোলি চাকতি পেয়েছে ও। রোদ্দুর লাগলেই চমকায়। সুজয়ের বন্ধু তাপস বলেছে, "আরে, এটা তো টিনকাটা, এ-নিয়ে কী হবে?"

চাকতিটা বেশ ধারালো। হাত কেটে যেতে পারে। মা দেখলে কিছুতেই রাখতে দেবে না। সুজয় তাই আগেই জাদুঘরে চলে এসেছে। আলমারির মাঝখানে চাকতিটা চমকাচ্ছিল, সুজয় মুগ্ধ হয়ে দেখল।

সুজয়ের খোঁজ করতে করতে মা জাদুঘরে

এবার নিন! প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

বুস্ট

মল্ট চকোলেট মিল্ক ড্রিঙ্ক

একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের যেমন, আপনারও তাই—দিনটাকে ঠিকমতো শুরু করতে দরকার অফুরন্ত শক্তি। তাই রোজ সকালে আপনার চাই বুস্ট।

এই শক্তির রসদ আপনাকে সারাদিন তরতাজা, আর চূড়ান্ত গতিমান করে রাখে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের, দৌড়ঝাঁপে যাদের শক্তি ক্ষয় হয় সবচেয়ে বেশী।

ওদের বুস্ট খেতে দিন। বুস্ট, মল্ট, কোকো আর দুধ থেকে তৈরী। পুষ্টির ব্যাপারে যারা সবথেকে ভাল বোঝেন সেই বিখ্যাত হরলিক্স নির্মাতাদেরই তৈরী-বুস্ট!

ঘন সুস্বাদু বুস্ট বেশী শক্তি যোগাতে অতুলনীয়, কারণ তা তৈরী হয় পুষ্টিকর ক্রীমযুক্ত দুধ, গম, মল্ট বার্লি আর কোকো থেকে।

আপনার ছেলেমেয়েকে সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে বুস্টে রয়েছে অধিক সংখ্যক পুষ্টিকর উপাদান।

আর তা'ছাড়া বুস্টের স্বাদ! সারা পরিবারের জিভে-জল-আসা ঘন মল্ট চকোলেটের মজা! বুস্ট।

দিন শুরু করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রতিদিন।

Boost 'হরলিক্স' নির্মাতাদের তৈরী

৫০০ গ্রাম-এর সাশ্রয়কারী রিফিল প্যাকেও পাওয়া যায়। এইটি কিনে ১ টাকা বাঁচান।

HTD-HMM-6820

চলে এলেন। রাগ করে বললেন, "স্কুল থেকে এসে হাত-মুখ ধোওয়া নেই, জামা-কাপড় পর্যন্ত পালটানো নেই। জানিস তোর জন্যে পায়েস রেঁধেছি।"

পায়েসের কথায় সুজয়ের খুব আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল যখন শুনল, কৃষ্ণনগর থেকে তার দিদিমণি এসেছেন। সুজয়ের যেমন মা, দিদিমণি সেইরকম মায়েরও মা। বেশ অবাক লাগে সুজয়ের। সে যেমন তার মায়ের কাছে বকুনি খায়, তার মাও কি সেরকম বকুনি-টকুনি খেয়েছেন!

সুজয় ঠিক করল, আজ আর বিকেলে খেলতে যাবে না। দিদিমণির সঙ্গে গল্প করবে। দিদিমণি খুব ভাল গল্প বলতে পারেন। শুধু কি রাক্ষস-খোক্কসের গল্প। দিদিমণি অনেক সত্যি গল্পও জানেন। দিদিমণি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। সুজয়দের বাড়িতে খুব পুরনো একটা চেয়ার আছে, সেই চেয়ারে নেতাজি নাকি বসেছিলেন! রোজ সকালে সুজয় সে চেয়ারে একবারটি হাত দেবেই। আর আছে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল। সে টেবিলে বারবার হাত রাখে সুজয়। ওই টেবিলে ওর ঠাকুর্দা খাওয়া-দাওয়া করতেন। টেবিলটা ফেটে গেছে। ওটা কেউ এখন ব্যবহার করে না বলে সুজয় টেবিলটা তার জাদুঘরে নিয়ে এসেছে।

সুজয় খুব উৎসাহের সঙ্গে দিদিমণিকে তার জাদুঘর দেখাল। দরজার গায়ে বড়-বড় করে লেখা 'সুজয়ের জাদুঘর'। দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন, "এ নাম কে দিয়েছে?" "আমি।" লাজুক মুখে উত্তর দিল সুজয়।

দিদিমণি জাদুঘরের সবকিছু দেখলেন, কিন্তু খুব একটা খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। মেয়েকে বললেন, "হ্যাঁ রে, ছেলেটা কি সবসময় ওই অন্ধকার ঘরে বসে থাকে? পুরনো ঘর, সাপ খোপও তো থাকতে পারে।"

মা বললেন, "কী করব বলো, কথা শোনে না। ওই জাদুঘর ওর প্রাণ, ওই নিয়েই তো সারাক্ষণ মেতে আছে।"

"ভূতের ভয় দেখাতে পারিস না?"

মা একটু ভয়ে ভয়েই বললেন, "মিথ্যে ভয় দেখানো নাকি খারাপ, ভিতু হয়ে যায়।"

দিদিমণি বললেন, "একটু-আধটু ভয় দেখালে কোনও ক্ষতি হয় না।"

দিদিমণি সুজয়কে ডেকে এ-কথা সে-কথা বলার পরে বললেন, "তোর জাদুঘরটা কি একটা ঘর? ঢুকলেই কেমন গা ছম-ছম করে। আলো নেই, হাওয়া নেই।"

কথাটা সুজয় কানেই নিল না। একটু অন্ধকার, ছায়া-ছায়া বলেই না ঘরটা ওর এত ভাল লাগে।

দিদিমণি এবার ভূতের ভয় দেখালেন। "ভূত-পেতনিরা ওইরকম ঘরই ভালবাসে।"

"ভূত-পেত্‌নি? ভূত বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি? তারা খায়? চান করে? ঘুমোয়? ভূতরা যখন কথা বলতে পারে ওদের সুবিধে-অসুবিধের কথা মানুষকে জানালেই পারে।"

প্রশ্নে-প্রশ্নে দিদিমণি নাজেহাল। ভয় পাওয়ার বদলে ভূত নিয়ে সুজয়ের কৌতূহল বেড়ে গেল।

মাঝ-রাত্রিতে সুজয়ের মায়ের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। অভ্যাসবশে সুজয়ের গায়ে হাত রাখতে গেলেন। ওমা! ছেলে তো বিছানায় নেই। খাট থেকে পড়ে গেল নাকি! মা বাবাকে তুললেন। না, সুজয় তো ঘরে নেই। গেল কোথায়? এ-ঘর ও-ঘর সব খোঁজা হল। সেজকাকু ছাত পর্যন্ত দেখে এলেন। হঠাৎ মা বললেন, "ও জাদুঘরে যায়নি তো!" জাদুঘরের চাবি থাকে নিতাইয়ের কাছে। নিতাই বলল, সুজয় আজ তাকে ও-ঘরের তালা বন্ধ করতে দেয়নি। চাবি সুজয়ের কাছে।

সবাই ছুটল সুজয়ের জাদুঘরে। গিয়ে দেখল জাদুঘরের শ্বেতপাথরের টেবিলে সুজয় ঘুমাচ্ছে। মা ওর গায়ে হাত রাখতে ধড়মড় করে উঠে বসল সুজয়। তবে কী ভূত এসেছে?

সুজয় জাদুঘরে এসেছিল ভূত দেখার জন্যে। ভূতের সঙ্গে কথা হোক বা না হোক একটু দেখা-শোনা তো হবে। কিন্তু ভূতের বদলে মা, বাবা, কাকু, পিসি, দিদিমণি এসে হাজির। এত রাত্রে এঁদের ঘুম ভাঙাল কে? নিশ্চয়ই নিতাইদা। চাবি কেড়ে নিয়েছে বলে রাগ করে বলে দিয়েছে। নিতাইদার ওপর খুব রাগ হয়ে গেল সুজয়ের। তবে সে রাগ দেখাতে পারল না। দোষ তো তারই। সে কেন ভূত দেখতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

ছবি অনুপ রায়

চিত্রনাট্য ঃ তরুণ মজুমদার
ছবি ঃ বিমল দাশ

শিবাজির বাবা শাহজি ছিলেন
বিজাপুরের একজন মনসবদার।
বিজাপুর দরবারেই তাঁকে থাকতে হত।
সুলতানের হুকুমে দলবল নিয়ে
এখানে-সেখানে যুদ্ধ করতে যেতে হত।

পুনা ছিল শাহজির খাস জায়গির। কিন্তু
সেখানে তাঁর যাওয়া হত কম।
তাই, পিতৃশাসনের বাইরে
ছেলে তাঁর স্বাধীনভাবেই মানুষ
হয়ে উঠেছিল

শিবাজিকে শায়েস্তা করার জন্যে
সেনাপতি লিয়াকত খাঁর নেতৃত্বে
সাত হাজার সৈন্য পাঠালেন
বিজাপুরের সুলতান···

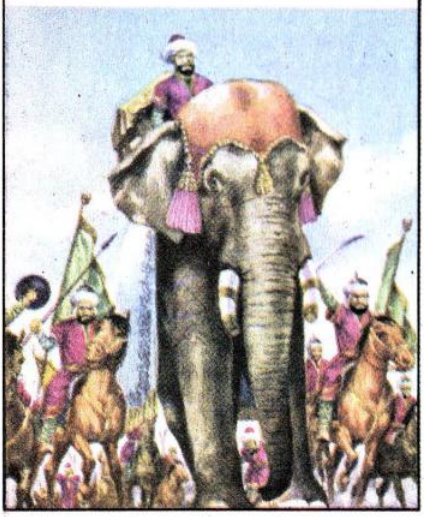

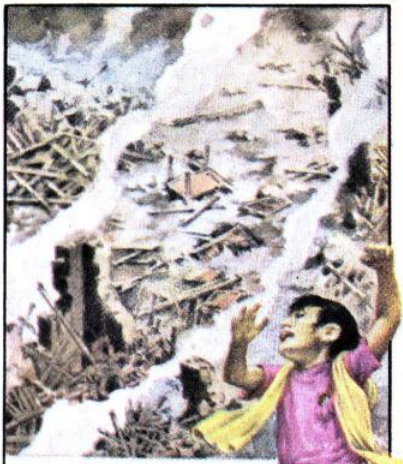

সদাশিবের বুদ্ধিবলে
এদের কী দশা
হয়েছিল—তা আমরা
সবাই জানি।

কিন্তু এরও কদিন আগে বিজাপুরের দরবারে যে-ঘটনাটা ঘটেছিল—সেটা এবার বলা দরকার।

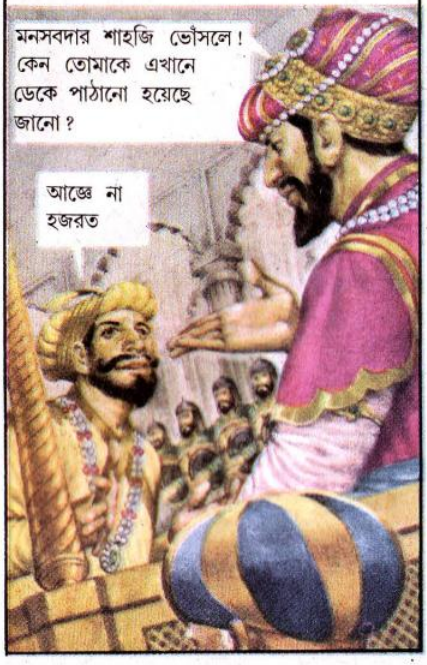

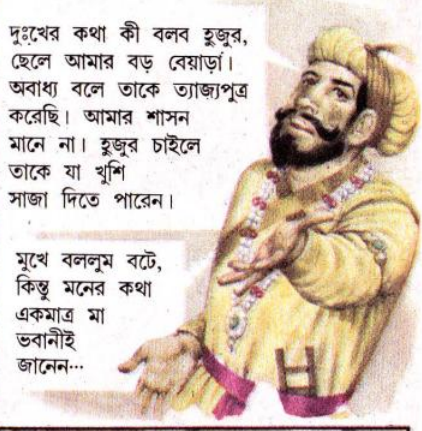

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
দু কোটি টাকার প্রলোভন সত্ত্বেও বসরানের কোচ হতে রাজি হয়নি রয়। তার স্ত্রী পেনি এখন বসরানে। রয়ও দলকে ঠিকমতো নেতৃত্ব দিতে পারছে না।
তুমি কাউকে বল দিচ্ছ না। দিলে আমরা দু গোলে এগিয়ে যেতুম।
আসল কথা, তোমার মাথার ঠিক নেই!
না না, ঠিক আছে!
একটু অপেক্ষা করো তোমরা!
কোথায় চললে?
আমরা বোধহয় বাড়াবাড়ি করছি, ব্ল্যাকি।
টেলিফোন করছে!
কোথায় করছে, কে জানে!
জানা গেল..
পেনিকে বললুম, সে যদ্দিন খুশি বসরানে থাক, আমরা এখানে ভালই আছি।
সেকেণ্ড হাফে ভাল খেলব সবাই।
ঠিক বলেছ!
চলো!
দ্বিতীয়ার্ধে
ঠেকিয়ে রাখো, ডালটন!
মনে হচ্ছে, গোল শোধ হয়ে যাবে।
DARLTON
ভার্নন এলিয়ট গোলে শট নিয়েছিল..
আঃ!
পানচ করে ঠেকিয়ে দিয়েছে!

বল গেছে রয়ের কাছে!
ঠিক বার-এ কিংবা পোস্টে মেরে বসবে!
ওর দ্বারা হবে না!
এবারে কিন্তু...
নাও, ডানকান!
পাস করেছে!
সর্বনাশ, ওকে দেখতেই পাইনি!
বল গোলে ঢুকল!
ঢুকে যা!
শোধ! শোধ!
শাবাশ!
রয় এখন প্রত্যেককে বল জোগাচ্ছে...
আঃ, চমৎকার পাস!
আবার গোল হবে।
কিন্তু হল না...
চমৎকার ঠেকিয়েছে!
ডালটিন জোর ঠেকিয়ে যাচ্ছে!
দর্শকদের মধ্যে ডালটিনের ভক্তই বেশি...
ডালটিন!
রোভার্স বুকুক, আমরাও ফেলনা নই!
চালিয়ে যাও!
মারো!
বল যাচ্ছে রোভার্সের গোলে...
গোল! গোওল!
দারুণ গোল দিয়েছে!
ভাবা যায় না!
ডালটিন ২, রোভার্স ১
আবার হারব আমরা?
ওরে, তোরা কী করছিস?
ক্লাব যে ডুবল! কী হচ্ছে ম্যানেজার-মশাই?
আমাকে ঠাট্টা করছে!
গোল শোধ না-হলে আমাকে ছিঁড়ে খাবে!
গোল কি শোধ হবে? রোভার্স কি সত্যি ডুবল?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

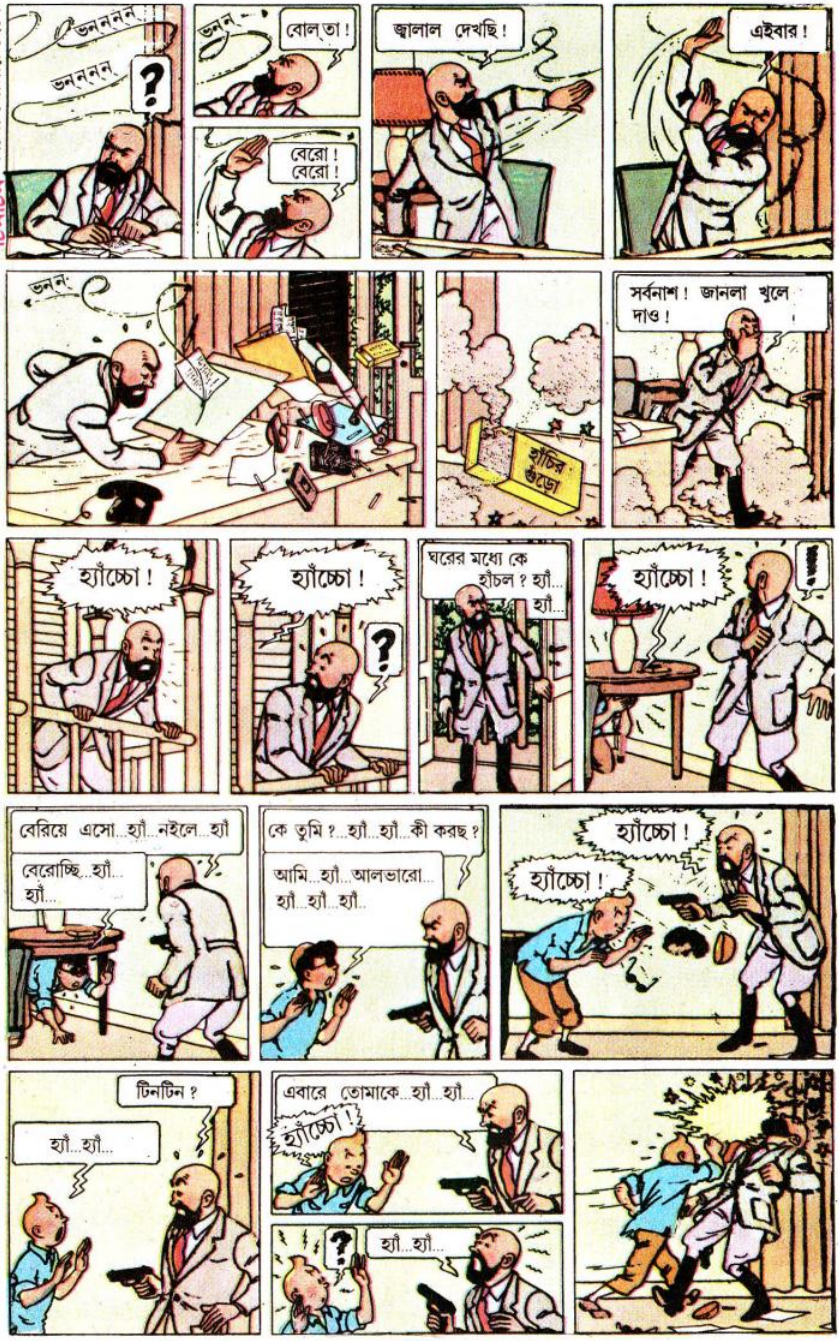

ভনননন
ভনননন
?
ভনন
বোল্ তা !
বেরো ! বেরো !
জ্বালাল দেখছি !
এইবার !
ভনন
হাঁচির গুঁড়ো
সর্বনাশ ! জানলা খুলে দাও !
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !
?
ঘরের মধ্যে কে হাঁচল ? হ্যাঁ... হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
বেরিয়ে এসো...হ্যাঁ...নইলে...হ্যাঁ
বেরোচ্ছি...হ্যাঁ... হ্যাঁ...
কে তুমি ?...হ্যাঁ...হ্যাঁ...কী করছ ?
আমি...হ্যাঁ...আলভারো... হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !
টিনটিন ?
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
এবারে তোমাকে...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
?
হ্যাঁ...হ্যাঁ...

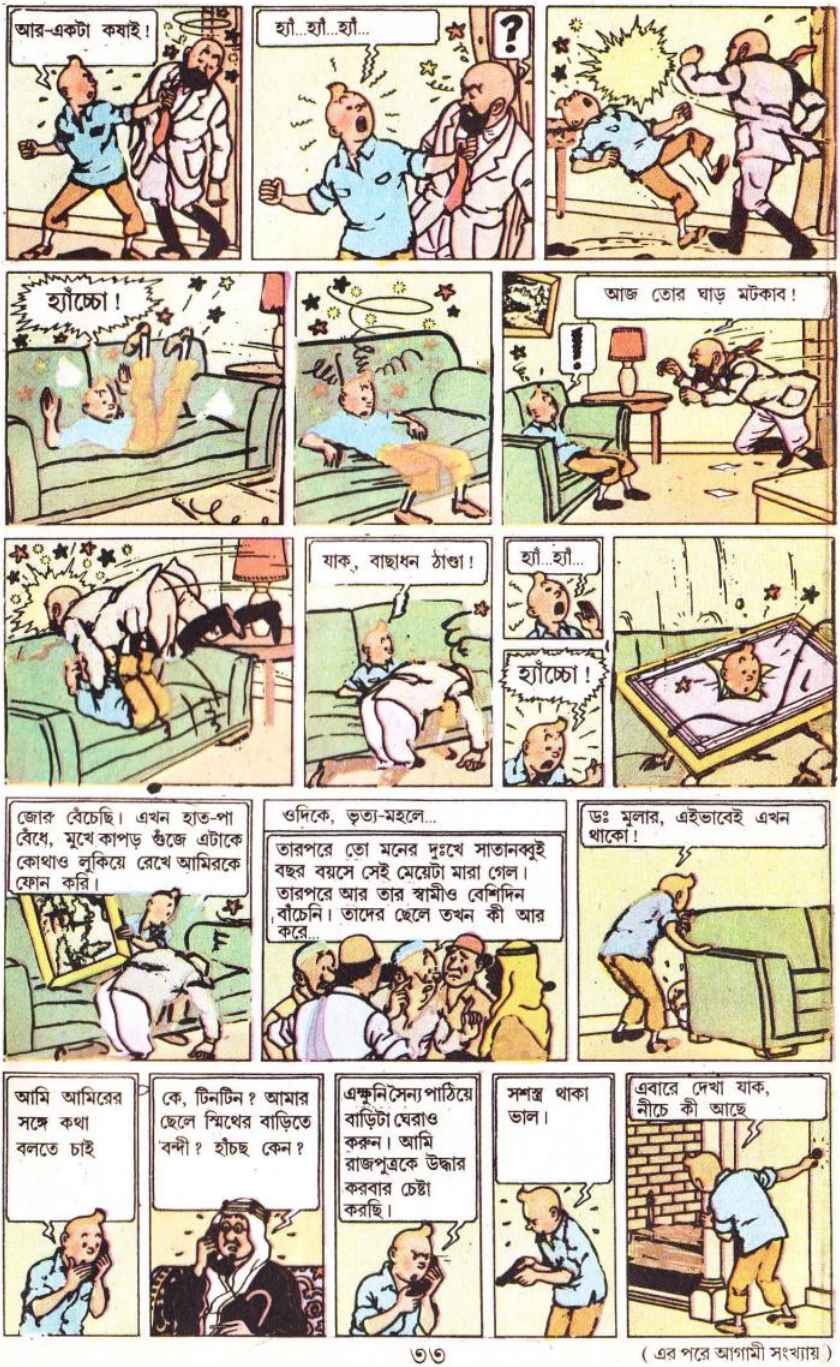

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	
■		■	■	■		■
৫		৬	■	৭		৮
	■	৯		■		
১০	১১		■	১২	১৩	
■		■	■	■		■
১৪			■	১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) কোন্ প্রাণী বোলারের হাতে থাকে? (৩) হরিণ। (৫) ঝগড়াঝাঁটির সঙ্গে কোন্ ঋষির নাম জড়িত? (৭) মুখ। (৯) অশ্বারোহী সৈন্য। (১০) আরামের একটি উপকরণ। (১২) চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে। (১৪) কারাগার। (১৫) ধানের গোলা।

উপর-নীচ : (২) বলবান প্রাণী। (৪) মিষ্টি নামের ছোট্ট ফুল। (৫) ধারাপাতের বিষয়। (৬) সমুদ্র। (৭) কী থেকে জানাশোনা বা বন্ধুত্ব হয়? (৮) স্বর্গের বিপরীত। (১১) দেবলোকের গায়কজাতি। (১৩) তবলার কেরামতি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

■	অ	ভি	ন	ন্দ	ন	■
■	ং	■	গা	■	গ	■
শি	শু	■	ধি	■	র	জ্জু
■	মা	■	রা	■	পা	■
ব	লী	■	জ	■	ল	ঘু
র্ষা	■	দ্বা	■	শা	■	ঙু
তি	তি	র	■	মা	গু	র

ধাঁধা

ছাদে দাঁড়িয়ে আমরা বাজি পোড়ানো দেখছিলাম, কালীপুজোর এখনও দুদিন বাকি, কিন্তু আমাদের সামনের বাড়িটায় সন্ধে থেকেই চলেছে বাজি পোড়ানোর ধুম। একজন ধরে আছে ইলেকট্রিক তার, একজন পোড়াচ্ছে রংমশাল। আর কানে তালা-ধরানো কালীপটকা তো ফাটছেই। সেজদাদু বলছিল, "এক-একজনের এক-এক রকম টেস্ট। কেউ ভালবাসে আলোর খেলা, কেউ ভালবাসে আওয়াজ।

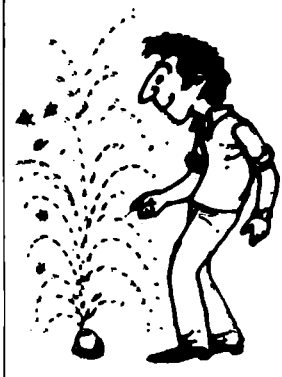

তবে আওয়াজের ভক্তরাই দলে ভারী।"

ছোটকা বলল, "আমরা কিন্তু ভক্ত ছিলাম তুবড়ির। ওঃ, ভাগ নিয়ে যা চলত না, এখনও মনে আছে। ভাগের ফরমুলা যেন এক-একজনের পেটেন্ট।"

কথাটা অবশ্য সত্যি। আমারও মনে আছে, ছোটকা দারুণ তুবড়ি বানাত। আর মসলা-মেশানোর ভাগটা কাউকে বলত না। আমি বললাম, "ছোটকা, এখনও তো দুদিন সময় আছে। এবার বানাবে তুবড়ি? বানাও-না।"

ছোটকা বলল, "না, নো মোর তুবড়ি বিজনেস। সেবার যা শিক্ষা হয়েছে আমার, আর তুবড়িতে নেই। নিজের ভাগে শেষ পর্যন্ত কিনা একটা তুবড়ি পড়ল! কষ্ট করে অতগুলো বানালাম, আর আমিই পেলাম না।"

ছোটকা সেদিন সেই দুঃখের গল্পটাই শোনাল। আর যা শোনাল তা দিয়ে তৈরি হয়ে যায় একটা চমৎকার ধাঁধা।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজন খুব ভাল তুবড়ি বানায়। সেবার সে ঠিক করেছে দারুণ কিছু তুবড়ি বানাবে। এমন সময় তার এক বন্ধু এসে তাকে ধরল, কয়েকটা তুবড়ি দিতে হবে। লোকটি বন্ধুকে বলল, "ঠিক আছে, যা বানাব তার অর্ধেক তোমায় দেব, সঙ্গে আরও একটা বেশি।" প্রথম বন্ধু খুশিমনে বিদায় নিল।

এরপরই এল আরেক বন্ধু। সেও তুবড়ি চায়। লোকটি তখন প্রথম বন্ধুর নাম করে বলল, তাকে দেবে বলে কথা দিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় বন্ধু তখন বলল, "ঠিক আছে। ওকে দিয়ে যা বাঁচবে আমাকে না-হয় তার অর্ধেক আর একটা ফাউ দিয়ে দিয়ো।" লোকটি অগত্যা রাজি হল।

দ্বিতীয় বন্ধু যেতে না-যেতেই এল তৃতীয় বন্ধু। সে খুবই ঘনিষ্ঠ। লোকটি তাই তৃতীয় বন্ধুকে প্রথম দুজনের কথা বলল। বলে বলল, "তবে তুমি যখন চাইছ, ওদের দুজনকে দেবার পর আমার যা থাকবে তার অর্ধেক এবং আরও একটা তোমাকে নিশ্চয়ই দেব।"

লোকটা তুবড়ি বানাল। এক-এক করে তিন বন্ধুই এল তার কাছে। সেও যেমন কথা দিয়েছিল সেভাবে তুবড়ি ভাগ করে দিল একের-পর-এক বন্ধুকে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, লোকটির নিজের জন্য বেঁচেছে একটিমাত্র তুবড়ি।

বলতে পারো, কটা তুবড়ি সেবার বানিয়েছিল লোকটি?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

ভা সু বি ব

তৃতীয় ধাঁধা ॥ চারটে পাঁচে এক শো হয়? কীভাবে?

গতবারের উত্তর ॥ (১) অদিতির কাছ থেকে ১, শীলার কাছ থেকে ১, এবং ইলার কাছ থেকে দুটি বই পেয়েছে ডোনা। (২) ৮২। (৩) শীতলপাটি।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

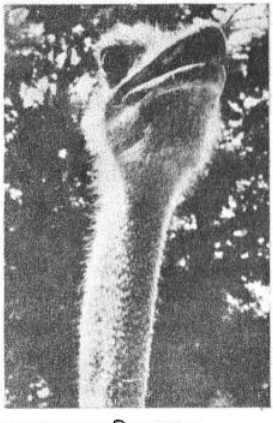

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ব্লেডের ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ আপনার ছাতাটা আনতে পারলাম না, একজন সেটা ধার নিয়েছে। আপনার কি খুব অসুবিধা হল?

উঃ একটু হল বই কি, আমি যাঁর থেকে ছাতাটা ধার নিয়েছিলাম, তিনি ওটা ফেরত চেয়েছেন।

প্রঃ কারা গান গাইতে গাইতে কাজ করে?

উঃ মশারা।

প্রঃ কার কাণ্ডজ্ঞান খুব বেশি ছিল?

উঃ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচয়িতার।

প্রঃ পুলিশের খোঁজ করছ কেন? কাছাকাছি কোনো পুলিশ তো দেখিনি। তোমার কি কোনো বিপদ হয়েছে?

উঃ বিপদ আমার নয়, আপনার। ঘড়ি, টাকাপয়সা—সব বার করে দিন।

প্রঃ আপনার টেলিফোন নাম্বার তো বললেন ডিরেক্টরিতে পাওয়া যাবে, আপনার নামটা তো জানা দরকার?

উঃ সেটাও ডিরেক্টরিতে আছে।

সুসেন

মজার খেলা

সেই যে আমরা একটা খেলা শিখেছিলাম, ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ফোঁটাঅলা তাস সাজিয়ে পনেরো করা, মনে পড়ছে? সোজাসুজি, লম্বালম্বি, কোনাকুনি—যে-দিক থেকেই যোগ করো না কেন, এমনভাবে তাসগুলো সাজানো হবে যে, যোগফল সবসময়ই হবে পনেরো। নিশ্চিত মনে পড়েছে।

এবারের মজার খেলার জন্যও চাই সেইরকমই যে-কোনও রঙের ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ফোঁটাঅলা ৯টি তাস। তবে এবার যোগফল হবে ১৭। হ্যাঁ, এমনভাবে তাসগুলোকে সাজাতে হবে টেবিলে, যাতে অন্তত পক্ষে তিনভাবে যোগফল ১৭ হয়।

পারবে? বন্ধুকে করতে দাও। দ্যাখো, সে পারে কিনা।

বন্ধু পারুক আর না-ই পারুক, তোমাকে তো করে দেখাতেই হবে। সুতরাং দেরি করে লাভ কী, এসো বরং দেখিয়ে দিই কীভাবে ১ থেকে ৯ ফোঁটাঅলা তাস সাজানো যায় যাতে অন্তত তিনদিক থেকে গুনলে যোগফল সব ক্ষেত্রেই হয় সতেরো। নীচের ছবি অনুসারে ৯টি তাস টেবিলে সাজিয়ে ফেলো, আর দ্যাখো কীভাবে প্রত্যেক দিক থেকেই যোগফল কেমন সতেরোই হচ্ছে—

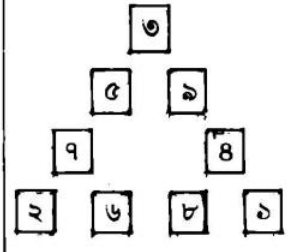

মজারু

হাসিখুশি

"তুমি অন্যায়ভাবে টেলিগ্রাফ অফিসের ক্লার্ককে মেরেছিলে কেন?"

"কী করব হুজুর? ওকে টেলিগ্রামের কাগজটা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। পরের চিঠি পড়া অন্যায়। তাই ওকে একটু শিক্ষা দিয়েছিলাম।"

"তুই কখনও 'পথের পাঁচালী' বইটা পড়েছিস?"

"না তো! বইটা কত সালে বেরিয়েছিল?"

"সাল-টাল মনে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, বইটা যখন বেরিয়েছিল তুই তখনও জন্মাসনি।"

"তাহলে তো বইটা আমার পড়ার কথা নয়।"

"পুরো এক বছর ধরে তোমাদের রেস্তোরাঁয় 'ফিশ ফ্রাই' খাচ্ছি, কিন্তু এত ছোট ফিশ ফ্রাই তো কখনও হয়নি।"

"ওটা আপনার চোখের ভুল সাহেব। ফিশ ফ্রাইয়ের সাইজ ঠিকই আছে, আসলে আমাদের রেস্তোরাঁটাই আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। তাই আপনার এরকম মনে হচ্ছে।"

ছবি দেবাশিস দেব

সীমানার লড়াই

(সুইজারল্যাণ্ডের উপকথা)

আরতি দাস

লুসার্ন হ্রদ দেখতে কিংবা আল্পস্ পাহাড়ের বরফের ওপরে স্কেটিং করতে দেশ-বিদেশের মানুষরা ভিড় করে আসে সুইজারল্যাণ্ডে। এ-দেশের গোলাপ-বাগানে এত সুন্দর সুন্দর সব গোলাপ ফোটে যে, দেখলে নাকি চোখ ফেরানো যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ির আদর পৃথিবীর সর্বত্র। সুইসদের বানানো চমৎকার চীজ আর চকোলেটের লোভেও অনেকে এ-দেশে আসে। সুইসরা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ।

বাইরের দেশের সঙ্গে সুইসরা তেমন বিবাদ না করলেও নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু ঝগড়াঝাটি করেছে মাঝেমধ্যে। উরি আর গ্লরাস্ সুইজারল্যাণ্ডের পাশাপাশি দুই পাহাড়ি এলাকা।

বেশ কয়েকশো বছর আগে—এই দুই এলাকার লোকদের মধ্যে সীমানা নিয়ে বেশ গণ্ডগোল বেধেছিল। এখনও ফেশ নদীর ধারে উরির সীমানা বরাবর হাঁটলে দেখা যাবে, গ্লরাসের বেশ কিছুটা এলাকা দখল করে নিয়েছে উরি। বাড়তি এই জায়গাটুকু কীভাবে উরির দখলে এল, সে-ঘটনা চমকপ্রদ, এবং দুঃখের।

উরি আর গ্লরাসের মাঝামাঝি এলাকার জমি নিয়ে দুই পক্ষের দু-রকম মত। দু পক্ষই দাবি করে এ-জমি তাদের। একদিন দেখা গেল, সীমান্ত এলাকার জমিতে উরির গরু-বাছুর দিব্যি চরে বেড়াচ্ছে। খবর পেয়ে গ্লরাসের লোকরা ভীষণ চটে গেল। তারপর ওদের গরু-ছাগল-ভেড়া এনে ছেড়ে দিল ওখানে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুদিকের গরু-ছাগল মিলেমিশে একাকার।

সন্ধেবেলায় গরু-বাছুর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সে এক ভীষণ ঝঞ্ঝাট!

ঝামেলা একরকম নয়। একদিন উরির এক চাষি গাড়িবোঝাই খড় এনে শুকোতে দিল দুই সীমানার মাঝখানের জমিতে। সারাদিন খটখটে রোদ্দুর গেছে। শেষবেলায় শুকনো খড় তুলতে এসে দেখে একটা খড়ও পড়ে নেই মাটিতে।

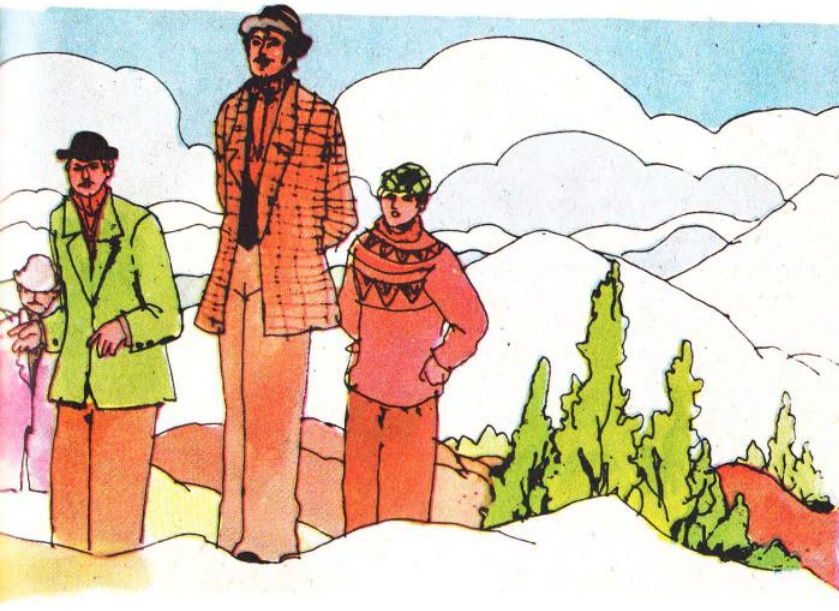

কাজটা গ্লরাসের মানুষদের। রোজ-রোজ গ্লরাসের এই রকম শয়তানি। একদিন হাতেনাতে ধরতে পারলে...। ওদিকে আবার গ্লরাসের লোকরা বলে "শয়তানিতে উরির জুড়ি নেই। আমাদের মহল্লার শিকারি হরিণ মারবে বলে যেই না ধনুকে তীর জুড়ছে, অমনি উরির এক উচ্চিংড়ে ছোকরা এসে জুটবে। আমাদের শিকারির আগেই তীর ছুঁড়ে ঘায়েল করবে হরিণটাকে। এ-রকম হামলা কার ভাল লাগে?"

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। শেষে দুদিকের মানুষজন বিরক্ত হয়ে দুই অঞ্চলপ্রধানকে ডেকে সমবেত হল এক সভায়। বিস্তর তর্ক-বিতর্কের পরে ঠিক হল, মহাবিষুব তারিখে (যে তারিখে দিন ও রাত্রি সমান) উরি ও গ্লরাসের দু'জন লোক দুদিক থেকে দৌড় শুরু করবে। ঠিক যেখানে এসে দু দলের দু'জন মিলবে, সেখানেই সীমানা চিহ্নিত হবে। ভোরের প্রথম মোরগ ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড় শুরু করতে হবে। দু-পক্ষই রাজি হল এ-কথায়। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দুই দলে।

উরির লোকরা একটা মোরগ বেছে ঝুড়িচাপা দিয়ে রাখল। মোরগটাকে বেশি খাবার দিল না। কারণ, ওদের ধারণা, যে মোরগ ভাল খেতে পায় না, খিদের জ্বালায় তার ভাল ঘুম হয় না। ভাল ঘুম না হলে ভোর হতে না হতেই ডেকে উঠবে মোরগ।

গ্লরাসের লোকরা একটা মোরগকে খুব ভাল-ভাল খাবার খাইয়ে দিব্যি মোটাসোটা করে ফেলল। ওদের ধারণা, ভাল খেতে পেলে খুশি হবে মোরগ। আর মনের আনন্দে সাত-তাড়াতাড়ি ডেকে উঠবে।

দৌড়ের দিন দারুণ উত্তেজনা। দুই এলাকার মানুষের চোখে ঘুম নেই। উরির দৌড়বীর রাত থাকতেই তৈরি হয়ে নিল। পুবের অন্ধকার ফিকে হতেই ডেকে উঠল উরির মোরগ। তক্ষুনি দৌড় শুরু করল উরির লোকটি।

পাহাড়ের পুবের দিকে গ্লরাস্। সেখানে আগেই ভোরের আলো ফুটেছে। অথচ মোটাসোটা মোরগটির ঘুম ভাঙার লক্ষণ নেই। গ্লরাসের মানুষ মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে মোরগটির চারপাশে। মোরগ না ডাকলে দৌড় শুরু হবে না। দেখতে দেখতে ঝকঝকে রোদে ভরে গেল চারদিক।

রোদ আরও ঝকঝকে হওয়ার পরে ডানা

ঝাপটিয়ে ডেকে উঠল গ্লরাসের মোরগ। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শুরু করল দৌড়বীর।

পথের কাঁটাঝোপে গা ছঁড়ে যাচ্ছে, পাহাড়ি রাস্তার নড়বড়ে পাথরে পা হড়কে যাচ্ছে। গাছের শেকড়ে হোঁচট খাচ্ছে, কিন্তু দৌড় থামাচ্ছে না দৌড়বীর। কিন্তু এ কী! পাহাড়ের চূড়ায় কাকে যেন দেখা যাচ্ছে না! উরির লোক নয় তো? ঠিক তাই। একটু পরেই দ্রুত নেমে এল উরির দৌড়বীর। হাতের লাঠি পাহাড়ের খাঁজে গেঁথে দিয়ে বলল, "এই হল সীমানা।"

গ্লরাসের লোকটি দেখল, ঠিক যেখানে দুজনে মিলিত হয়েছে সেখানেই সীমানার লাঠি পুঁতে দিয়েছে উরির দৌড়বীর। রাগে-দুঃখে চোখ ফেটে জল এসে গেল গ্লরাসের প্রতিযোগীর। কোনোমতে বলল, "ভাই, অনেক বেশি জমি দখলে এসেছে তোমাদের। দোহাই তোমার, কিছুটা জায়গা আমাদের গরু-ছাগল চরাবার জন্যে ছেড়ে দাও।"

উরির লোক তার দখল ছাড়বে কেন? শেষে অনেক করে বলার পরে নরম হল উরির প্রতিযোগী। বলল, "তুমি আমাকে কাঁধে তুলে এই পাহাড়ের উঁচুর দিকে যতটা উঠতে পারবে, ততটা জমি ছেড়ে দেব তোমাদের।"

তাতেই রাজি হল গ্লরাসের প্রতিযোগী। কিন্তু ওর তখন দম ফুরিয়ে গেছে। উরির শক্ত-সমর্থ, ভারী ওজনের লোকটিকে কাঁধে বয়ে খানিকটা ওপরে ওঠার পরেই মাটিতে পড়ে গেল গ্লরাসের প্রতিযোগী। আর উঠল না।

ততক্ষণে দুই মহল্লার অঞ্চলপ্রধান নিজেদের লোকজন নিয়ে এসে পড়েছে। সীমান্ত-এলাকা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

গ্লরাসের মাতব্বর লোকটি নিজেদের দৌড়বীরের মৃতদেহ কিছুক্ষণ দেখার পরে বলল, "উরির মানুষ শোনো, আমাদের মোরগ ডাকতে অনেক দেরি করে ফেলেছে। সে-জন্যে অনেক বেশি জমি দখল করতে পেরেছ তোমরা। জমি কম পেলেও আমরা একজন সত্যিকারের বীরের জন্য গর্ব অনুভব করছি।"

নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। ধীরে ধীরে দুই এলাকার সীমান্ত চিহ্নিত হয়ে গেল।

ছবি দেবাশিস দেব

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

বিজ্ঞান কি?

সমস্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা চলে। তার সঙ্গে মিশে আছে জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল। কোন জিনিসই অভ্রান্ত সত্য নয়, এটা ধরে নিয়েই অগ্রসর হ'তে হয়।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে কিন্তু আমরা প্রশ্নাতীতভাবেই ধরে নিয়ে থাকি। অথচ এর মধ্যেও জানবার, বুঝবার এবং উন্নতি করবার সম্ভাবনা থাকে।

কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানকে আমরা যদি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে বিচার করি এবং জ্ঞান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে চলি, তা'হলে বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ হয়। যেমন ধর, পথ চলতে বহু গাছ আমরা দেখি। অথচ এইসব গাছের নাম, প্রকৃতি, উপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা মোটেই কৌতূহলী নই।

তেমনি বহু পশুপক্ষীও আমাদের চোখে পড়ে। অথচ এদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি বা জানবার চেষ্টা করি।

সেইজন্যই বলছিলাম একদিকে যেমন পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়, হাতে-কলমে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়, তেমনি চোখ কান খুলে রাখলে অনেক কিছু সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ জন্মায়।

এই পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, ভূমি, প্রাণী এবং জড় পদার্থের মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—শীতকালে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সাইবেরিয়ার হাঁস ঠিক একটি জলাভূমি লক্ষ্য করে প্রতি বছর উড়ে আসে। কেন আসে, কেমন করে আসে এবং কেমন করে ফিরে যায় সেটাই রহস্য।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ., ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।)

সরল জীবন

সুদেব পাত্র
বয়স ১৫

ছোট্ট গ্রাম। ভোর হতেই শোনা যায় কোকিলের ডাক। ছোট-ছোট মাছ পুকুরের জলে সাঁতার কাটে। আমগাছের আম ঝুলে পড়ে পুকুরের জলে।

ঘর থেকে খেতের দিকে পা বাড়ালেই দেখা যায় মেঠো চড়ুইয়ের দল। জল-ভরা খেতে দেখা যায় বক অথবা সারসের দল। গ্রামের বুক চিরে গেছে একটা সরু খাল। রাখালের গরু লেজ তুলে সাঁতার কেটে অপর পারে গিয়ে সবুজ ঘাস খায়। এক ঝাঁক হাঁস অথবা জল-পিপি অনেক দূর থেকে উড়ে এসে পুকুরে সাঁতার কাটে।

চাষিরা সারা দিন মাঠে কাজ করে। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে গল্প করে, তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমোয়। এইভাবেই তাদের সরল জীবন কেটে যায়।

চোর ধরার গল্প

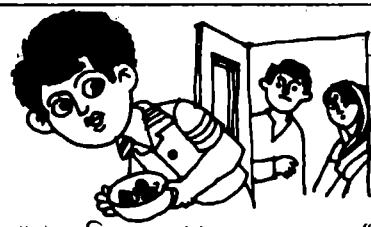

সুবীর ঘোষ
বয়স ১১

একবার বুকুনদের বাড়িতে খুব খাবার চুরি হতে লাগল। বুকুন বলল, "এটা নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টু বেড়ালের কর্ম। এই তো সেদিন আমার বন্ধু বুকাইদের বাড়ি থেকে বেড়ালে মাছ আর দুধ খেয়ে পালিয়েছে।"

একদিন বুকুনের মা দুপুরবেলা কেক তৈরি করে টেবিলে রাখলেন। কিন্তু বিকেলে এসে দেখলেন, কেক নেই। চুরি এরকমভাবে বাড়তেই লাগল। বেড়ালে মাছ, মাংস ছেড়ে শেষে কিনা কেক খেতে শুরু করল! মা তো রেগে আগুন, বললেন, "চোরকে ধরতে পারলে গরম খুন্তির ছেঁকা দিয়ে ছাড়তাম!" কিন্তু ধরতে পারলে তবেই তো, এদিকে চোর যে কখন আসে কখন যায়, কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু বুকুনের মেজদা হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি রহস্য ভেদ করার জন্য একটা কায়দা করলেন।

সেদিন বাড়িতে মাংস হয়েছিল। রাত্রের জন্য মা একটা বাটিতে কিছুটা মাংস রেখে দিলেন। এদিকে মেজদা ব্যাটারি আর তার দিয়ে এমন এক ব্যবস্থা করলেন যে, কেউ বাটি ছুঁলেই পাশের ঘরে একটা লাল টুনি বাল্ব্ জ্বলে উঠবে। কিন্তু বুকুন ছোট বলে ব্যাপারটা তাকে জানানো হল না। দুপুরে খাওয়ার পরে সবাই শুয়ে পড়ল। মেজদা কিন্তু জেগে রইলেন পাশের ঘরে। হঠাৎ লাল আলো জ্বলে উঠল। খাবার ঘরে উঁকি মারতেই মেজদার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি চুপি-চুপি মাকে ডেকে আনলেন। মা ধমক লাগালেন, "কী হচ্ছে বুকুন?" আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাবড়ে গিয়ে চোর বাবাজি বুকুনের হাত থেকে মাংসের বাটি ধপ করে পড়ে গেল নীচে।

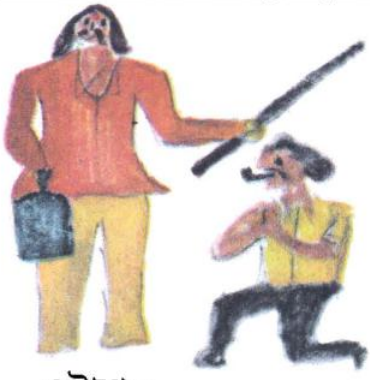

ঘণ্টারাম

এ-পাড়ার ঘণ্টা পাল
থ্যাব্‌ড়া-মুখো ফোলা গাল
পথে বেরুলে ঘণ্টারাম
সবার মুখে রামনাম
লাঠি দিয়ে একে-তাকে
খোঁচা মারে চোখে-নাকে

ছড়া ও ছবি : প্রবাল সেনগুপ্ত
(বয়স ৬)

লাল ফল খাসনে

ওরে পাখি যাসনে
লাল ফল খাসনে
ও ফলটা পাকা
রেখে গেছে কাকা

ছড়া ও ছবি : শ্রীজিৎ দাশগুপ্ত
(বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে কুশল সেনগুপ্ত (বয়স ৭)

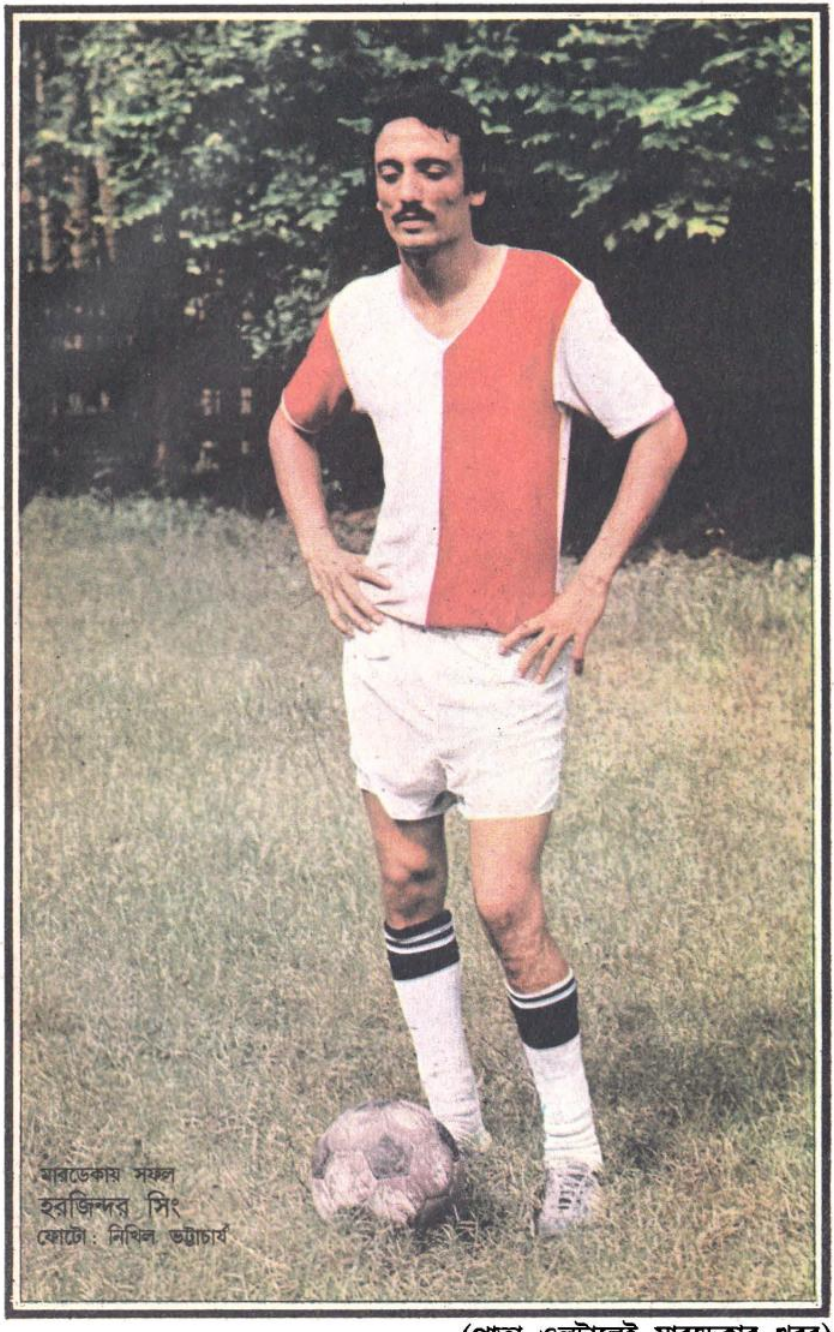

মারডেকায় সফল
হরজিন্দর সিং
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

মারডেকায় ভারত

শ্যামসুন্দর ঘোষ

মারডেকা ফুটবলে ভারত কিছুটা সুনাম অর্জন করেছে। দীর্ঘ দশ বছর বাদে এই প্রথম ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবল-আসরে সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। আর শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে ভারতকে বিদায় নিতে হয়েছে এমন এক দলের কাছে হেরে, যাদের ক্রীড়াগত দক্ষতা ভারতীয় ফুটবলের চেয়ে অনেক বেশি। ব্রাজিলের সাও পাওলো দল ভারতের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে জয়লাভ করলেও ফাইনালে তারা পরাজিত হয়েছে ইরাকের কাছে। যে ইরাককে তারা পরাজিত করেছিল গ্রুপ লীগে ২—১ গোলে।

কুয়ালালামপুরে সাও পাওলো ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। আর দর্শকদের ভালবাসা বা শুভেচ্ছা আদায় করার ব্যাপারে তারা যে দক্ষ, তা তাদের আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে। খেলার দিন ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা মাঠে হাজির হতেন কিছু ফুল ও মালয়েশিয়ার জাতীয় পতাকা নিয়ে। খেলোয়াড়েরা প্রথমেই ছুটে যেতেন সেণ্টার লাইনে। সেখানে সমবেত খেলোয়াড়রা মালয়েশিয়ার জাতীয় পতাকা ঘিরে জাতীয় সংগীতের দুটি লাইন উচ্চারণ করতেন। তারপর **শ্রদ্ধাভরে** জাতীয় পতাকাকে ভাঁজ করে তুলে দিতেন দলের ডাক্তার মারকোর হাতে। পরক্ষণে খেলোয়াড়রা ছুটে যেতেন দর্শকদের কাছে ফুল বিতরণের জন্যে।

সাও পাওলো দলের পরেই ভারত ছিল মারডেকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। কারণ, মালয়েশিয়ার শতকরা ১০ ভাগ লোক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাই ভারতের খেলা থাকলেই তাঁরা হাজির হতেন ভারতীয় দলকে সমর্থন করতে। আর তাছাড়া অন্যান্য বছরের তুলনায় ভারত এবার ভাল খেলতে থাকায় অনেকের আশা ছিল ভারত সেমিফাইনালে যাবে। ভারত অবশ্য তাদের আশা পূর্ণ করেছে। তবে সেক্ষেত্রে ভাগ্য কিছুটা যে সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, যে-দুটি খেলার ফলাফলের উপর ভারতের সেমিফাইনালে ওঠা সম্ভব হয়েছিল সেই দুটি খেলার ফলাফল ভারতের অনুকূলে এসেছে শেষ মুহূর্তে। আর তাছাড়া ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের হাতে নিউজীল্যাণ্ডের শেষ মুহূর্তের গোলে পরাজয়ও ভারতকে সেমিফাইনালে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। অথচ নিউজীল্যাণ্ড সেদিন যা খেলেছিল, তাতে তারা যদি চার-পাঁচ গোলে জয়লাভও করত, তাহলেও কারো কিছু বলার ছিল না। ৯০ মিনিটের মধ্যে ৭০ মিনিট বল ঘোরাফেরা করেছে আরবদের গোলের সামনে। বার-দুই বল ক্রসবারে লেগে ফিরেও এসেছে। ঐদিন খেলা অমীমাংসিত থাকলে নিউজীল্যাণ্ড সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করত।

আরব দল ভারতকে আরো একটা সাহায্য করেছিল মালয়েশিয়াকে হারিয়ে। ভারত ও মালয়েশিয়ার খেলাটা ছিল গ্রুপের শেষ খেলা। এর আগের খেলাটি ছিল ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে। এই খেলায় মালয়েশিয়া যদি জিতত, তাহলে তাদেরও সেমিফাইনালে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার শুধু প্রয়োজন ছিল ভারতকে হারানো।

প্রথম দুটি খেলায় হারের পর মালয়েশিয়া যখন ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জিতল, তখন ওখানকার কাগজগুলি এমনভাবে খবর ছাপছিল যাতে একসময় মনে হয়েছিল জাপানের সঙ্গে মালয়েশিয়া বুঝি সেমিফাইনালে যাবে। আসলে ভারতের গ্রুপে সব দলই ছিল মাঝারি ধরনের।

অপর গ্রুপে প্রতিযোগিতা কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র তিনটি দলের মধ্যে—সাও পাওলো, ইরাক এবং দক্ষিণ কোরিয়া। ব্রাজিলের সাও পাওলো দলটা ওখানকার দ্বিতীয় ডিভিশনে অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া। এঁরা সবাই অবশ্য পেশাদার খেলোয়াড়। দলের সঙ্গে এসেছিলেন মোট ছাব্বিশজন। দলের যিনি ডাক্তার, তিনি হচ্ছেন সাও পাওলো ক্লাবেরও ডাক্তার। গত এপ্রিলে সাও পাওলো ক্লাবে ডাক্তার মারকোর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। কুয়ালালামপুরে সাও পাওলো ক্লাবের খেলোয়াড় ও ভারতীয় দল একই হোটেলে একই তলায় থাকতেন। ভারতীয় দলের সঙ্গে কোনো ডাক্তার না-থাকায় প্রতিদিন খেলার পরে খেলোয়াড়েরা ছুটতেন মারকোর কাছে। মারকো শুধু ওষুধ বা ইনজেকশন দিয়েই সাহায্য করেননি, প্রতিদিন

ভাস্কর বল ধরেছেন (ভারত বনাম সাও পাওলো)

ভারতীয় দলের খেলার পর শুভেচ্ছা জানিয়ে গিয়েছেন।

ব্রাজিলের সঙ্গে ভারতীয় দলের সম্পর্ক এত ভাল ছিল যে, দুদলের খেলোয়াড়দের যখনই দেখা হত, তখনই চোখে-মুখে আন্তরিকতার ভাব ফুটে উঠত।

মারডেকা ফুটবলে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা প্রত্যেকেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন ভাল খেলার জন্যে। অতীতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যেত খেলোয়াড়েরা পা বাঁচানোর জন্যে ভালভাবে খেলেন না। এবারের এই দল সম্বন্ধে কিন্তু সে-কথা খাটে না। অনুশীলন ও নিয়মানুবর্তিতার উপর প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জি কড়া নজর দিয়েছিলেন। খেলোয়াড়েরা সংগ্রাম চালিয়েছেন খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আর তারই ফলস্বরূপ জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত অন্তিম লগ্নে গোল করেছে। ছটি খেলায় ভারত জিতেছিল দুটিতে—ইউ. এ. ই. (২—০) ও ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে (১—০); ড্র করেছে নিউজীল্যাণ্ড(০—০) ও মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে (২—২); আর জাপানের বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করেও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করেছে ২—৩ গোলে। সেমিফাইনালে সাও পাওলো ক্লাবের কাছে যে ২—০ গোলে হেরেছে, সে-কথা আগেই বলেছি। তবে সাও পাওলোর বিরুদ্ধে প্রথম তিরিশ মিনিট ভারতেরই প্রাধান্য ছিল। ঐ সময় পর্যন্ত ভারতীয় গোলকীপারকে কোনো শট আটকাতে হয়নি।

ভারতীয় দলে কে কেমন খেললেন? প্রথমেই যে-খেলোয়াড়টির প্রশংসা করতে হয় তিনি হচ্ছেন হরজিন্দর। হরজিন্দরের বুদ্ধিদীপ্ত খেলা ওখানকার দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। ৪—৪—৩ প্রথায় খেলায় ভারতের সবচেয়ে জোর ছিল মাঝ-মাঠে। হরজিন্দর মাঝ-মাঠেও খেলেছেন ও পুরোভাগেও খেলেছেন। বিদেশ, প্রসূন, মিহির, কম্পটন, মনোরঞ্জন, প্রত্যেকেই ভাল খেলেছেন। সবচেয়ে হতাশ করেছেন আক্রমণভাগের কয়েকজন খেলোয়াড়।

ফোটো : মনোজিৎ চন্দ

কেউ জেতেনি, কেউ হারেনি

বজ্রসেন

১৯৮১-র ২৬ সেপ্টেম্বর ফুটবল অন্তত একবারের জন্যে ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে? তা হলে ভেঙে বলতেই হয়। কবে কোন ভুলে-যাওয়া অতীতে কে যেন লিখেছিলেন কিংবা বলেছিলেন—'গ্লোরিয়াস আনসার্টেনটি অব ক্রিকেট'। ক্রিকেটের অসাধারণ অনিশ্চয়তা। 'গৌরবময়' বা 'মহান' বিশেষণগুলো ব্যবহার করলাম না ইচ্ছে করেই, কারণ ওগুলোতে অবস্থাটা বোধ হয় সঠিক বোঝানো যায় না। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে এবারের আই. এফ. এ শীল্ড ফাইনাল খেলার পর একটি কথাই মনে হচ্ছিল—অনিশ্চয়তা ক্রিকেটের একচেটিয়া নয়। মোহনবাগানের জেতা ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল জিতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মোহনবাগান আবার মোহনবাগান হয়ে উঠল গোল শোধ করে। মাঠে ঢোকার সুযোগ যাঁরা সেদিন পাননি, কিংবা সুযোগ পেয়েও যাঁরা সেদিন মাঠে যাননি, পরে তাঁরা কপাল চাপড়েছেন। টি ভি দেখে কি আর তৃপ্তি হয়? সে তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর শামিল।

পরিসংখ্যানের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই—কে কতবার ফাইনালে উঠে কতবার শীল্ড পেল, দু'দলের সাক্ষাৎকারে বেশিবার জিতেছে কে, ইত্যাদি গবেষণা এতদিনে বহুবার হয়ে গেছে। মোহনবাগানকে পর-পর পাঁচবার (১৯৭৬-৭৯, ৮১) শীল্ড বিজয়ী বলারও কোনো মানে হয় না—কারণ যুগ্ম-জয় প্রকৃত জয় নয়। ওটা একটা ফাঁকি, ছেলে-ভোলানো ব্যাপার। আর পাঁচবারের মধ্যে তিনবারই (১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮১) যুগ্ম-জয়। তার চেয়ে আগে বরং গত বিশ বছরের মধ্যে সেরা এই শীল্ড ফাইনালটির সম্পর্কেই দু'চার কথা বলা যাক। এই মোহনবাগানকে ইস্টবেঙ্গল কি আর কোনওদিন পাবে? সত্যি কম্পটন, সুব্রত, শ্যামল, মিহির ও পায়াস নেই, এমন অবস্থায় মোহনবাগান যে শেষ পর্যন্ত শীল্ডে খেলেছে, সেটা বিরল খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় হলেও তাতে একটা বিরাট ঝুঁকি ছিল, যে ঝুঁকি মহমেডান নিতে চায়নি। বিশেষত, ফাইনালে যেখানে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লড়াইয়ে মর্যাদা বা সম্মানের প্রশ্নটি অবধারিতভাবেই এসে যায়। ইস্টবেঙ্গলেরও অবশ্য পূর্ণ শক্তি ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রে গরহাজির তো মাত্র দু'জন—মনোরঞ্জন এবং অমলরাজ। কিন্তু দুর্বল মোহনবাগানই এগিয়ে গিয়েছিল তাদের একাশির মরসুমের সোনার ছেলে অরূপের গোলে। কিন্তু পয়মন্ত সোমনাথ যে আবার মফতলালের খেলার মতোই মাঝখানে নেমে গোল শোধ করে ইস্টবেঙ্গলকে ফিরিয়ে আনবে খেলার মধ্যে, তা কি কেউ ভেবেছিল? না গোল শোধের উল্লাসের চিৎকার মিলিয়ে যেতে না যেতেই চন্দ্রবাহাদুর থাপার দর্শনীয় গোলে ইস্টবেঙ্গলের এগিয়ে যাবার

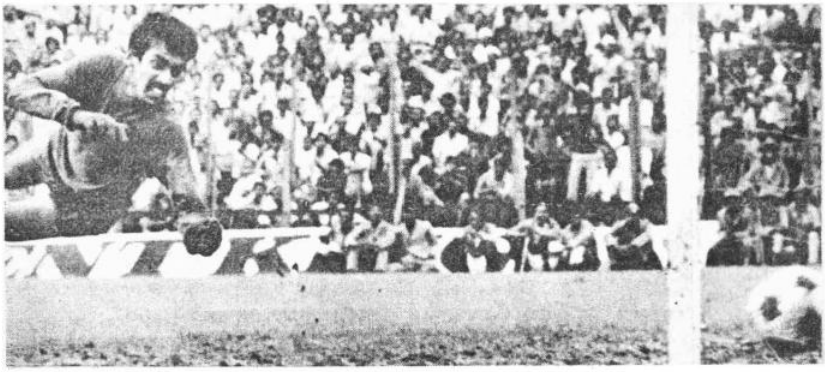

অরূপের শটে বিশ্বজিৎ পরাস্ত

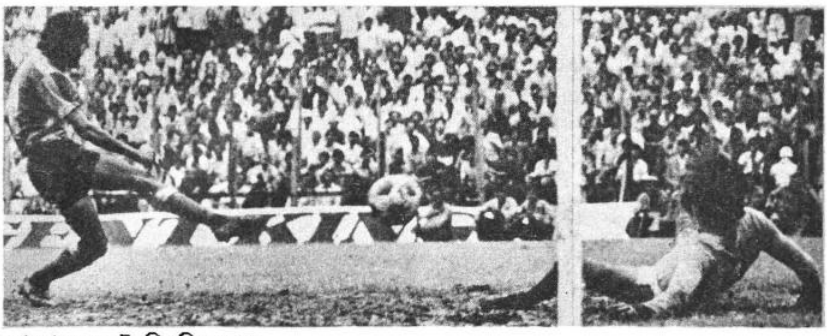

সোমনাথের শটে শিবাজি পরাস্ত

সম্ভাবনার কথা?

কিন্তু নাটকের তখনও কিছুটা বাকি ছিল। বিজয়লক্ষ্মী যখন ইস্টবেঙ্গলের গলায় মালা পরাতে যাচ্ছেন তখন—তিরিশ সেকেণ্ড বাকি থাকতে—ডি'সুজা গোল শোধ করায় মোহনবাগানও ছুটে গিয়ে সেই মালায় গলা ঢুকিয়ে দিল, যেন বলল, দেবী, ওটা আমাদেরও প্রাপ্য!

মফতলালকে হারিয়ে দিয়ে ইস্টবেঙ্গল যেদিন ফাইনালে উঠেছিল, সেদিন সন্ধ্যায় মজিদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "শনিবার কী হবে?" ছোট্ট করে হেসে তিনি বলেছিলেন, "উই শ্যাল ট্রাই টু উইন।" পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়েছিলেন, "নো, নো, উই হ্যাভ টু উইন।" কারণ, মজিদকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, "আপনারা তো এ-বার মোহনবাগানের কাছে দু'বার হেরেছেন।" আবার রাত্রে যখন গৌতম সরকারকে টেলিফোন করলাম, গৌতম বললেন, "আমরা সবাই ফিট, শরীরের শেষ শক্তিটুকুও উজাড় করে দেব ইস্টবেঙ্গলকে হারাবার জন্যে।" মজার ব্যাপার, দু'দলের দু'টি গোলেই এই দু'জনের বিরাট ভূমিকা ছিল। মোহনবাগানের প্রথম গোলের মূলে গৌতমের ফ্রী-কিক, আর দ্বিতীয়টি এসেছে তারই আউটসুইং থ্রু থেকে। তেমনি ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোল যে আক্রমণের ফসল, সেটি এসেছে মজিদের লব থেকে, এবং দ্বিতীয় গোলটির ক্ষেত্রেও থাপা বল পেয়েছিলেন মজিদেরই কাছ থেকে। এবং গৌতমের বুদ্ধির কাছে মজিদ একবার পরাস্তও হয়েছেন—গোলের মাত্র সাত-আট গজ দূরে। তবে উলাগা যে সুযোগ নষ্ট করেছেন, সেটাই ছিল খেলার সহজতম সুযোগ।

উপরে যা লিখলাম, তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, গৌতম ও মজিদ ছাড়া কেউ সুবিধা করতে পারেননি। বিশ্বজিৎ দাস, সুধীর, ম্যাচাডো, ফরিদও ভাল খেলেছেন, বিশেষত বিশ্বজিৎ বারবার দলের পতন রুখেছেন। অপরদিকে বহুযুদ্ধের সেনাপতি হাবিব, বিশ্বজিৎ বসু, প্রদীপ চৌধুরী, সমর ভট্টাচার্যও ছাড়েননি। দুঃখ হয় শুধু শিবাজির জন্যে। তাঁর পায়ে লেগে বল ফিরে আসাতেই ইস্টবেঙ্গল গোল শোধ করে। বেচারা শিবাজি! জামশিদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হওয়ায় তাঁর ভারতীয় শিবিরে যাওয়ার ব্যাপারটাও অনিশ্চিত হয়ে গেল!

আই. এফ. এ শীল্ড তবুও মোহনবাগানের ঘরেই আসত—যদি পঁয়ষট্টি মিনিটে (তখনও ইস্টবেঙ্গল গোল করেনি) সুরজিতের গোলটি নাকচ না হত। ওই গৌতমেরই কর্নার কিকে ডি'সুজা হেড করার পর বলটি ক্রসবারে লেগে ফিরে এলে সুরজিৎ গোল করতে ভুল করেননি। কিন্তু এই গোলটি বাতিল হল! না হলে ২—০ গোলে এগিয়ে যাওয়া মোহনবাগানকে আটকানো ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে শক্ত হত। রেফারীর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা সবাই ক্ষুব্ধ, ইস্টবেঙ্গলের সকলেই আনন্দিত হলেও বিস্মিত। গৌতম সরকার আমাকে রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বললেন, "বারবার রেফারীর ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হচ্ছি আমরাই। কালকের খেলার আগের দুটি খেলার কথাও ভাবুন। এবারের ফেডারেশন কাপ ফাইনালের ফার্স্ট লেগে মিহিরের গোলটা বাতিল হল, তার আগের বার ম্যাথুজ পেনালটি এরিয়ায়

সোনালীর ফুটফুটে রূপের বাহার লাক্সেরই প্রসাধনে

সোনালীর দীঘল চোখে রূপের ঝিলিক খেলে।
গোলাপের মত ওর এই ফুটফুটে রূপের বাহার
লাক্সেরই প্রসাধনে।
ওর নিজের কথায় শুনুন—**"আমার রূপ-লাবণ্য
কোমল আর সুন্দর রাখার জন্যে আমার
প্রসাধন সাবান—লাক্স!"**

Sonali Gupta

HLL 5604

**শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।**

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

প্রদীপ ও মজিদ

বিদেশকে পরিষ্কার ল্যাং মেরে ফেলে দিল, তবুও কিচ্ছু হল না।

খেলা-পরিচালনা নিম্নমানের হয়েছে, সন্দেহ নেই। সেমিফাইনালে পরাজিত মফতলালের কোচ মকবুল সাহেব আমার কাছে একই অভিযোগ করেছেন। বললেন, "আমরা যখন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ১—০ এগিয়ে, তখন ম্যাচাডো রতন থাপার হাত টেনে রেখে দিয়েছিল পেনালটি এরিয়ায়, কিন্তু রবি চক্রবর্তী আমাদের পেনালটির আবেদন নস্যাৎ করলেন!"

যাক এ-সব কথা। গতস্য শোচনা নাস্তি। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল দু'দলের খেলোয়াড় ও সভ্য-সমর্থকরাই ভাবছেন, এ-খেলাই শেষ খেলা নয়। আবার দেখা হবে—সে যেখানেই হোক। সিকিম কিংবা দার্জিলিং, দিল্লি কিংবা বোম্বাই। তখন দেখা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আফশোসটাও হচ্ছে—ওঃ, ২৬ সেপ্টেম্বর যদি...

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

বই-সংগ্রহের বাতিক

জীবন ভৌমিক

লণ্ডন শহরে রিচার্ড হেভার নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। বিরাট ধনী। একা মানুষ।

একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পুরনো বইয়ের দোকানে একটা কবিতার বইয়ের দিকে নজর পড়ল হেভারের। মনে পড়ল, তাঁর এক বন্ধু এক সময় বইটি সংগ্রহ করার জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। রিচার্ড হেভার দু' শিলিং দিয়ে ঐ পুরনো বইটা কিনে নিলেন। এবং সেই থেকে ভদ্রলোককে বই কেনার নেশায় পেয়ে বসল। সারা জীবন ধরে তিনি বই কিনেছেন।

হেভার হয়তো খবর পেলেন একশো মাইল দূরে এক শহরে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই বিক্রি হচ্ছে। ব্যস, হেভার সেখানে গিয়ে হাজির। বই-পাগলা হেভার নানা ভাষার নানা ধরনের বই কিনতে লাগলেন। বই আর বই। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বুড়ো বয়সেও তিনি কেবল বই কিনে যেতে লাগলেন। কিন্তু—

এত বই রাখবেন কোথায়! লণ্ডন শহরে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়িখানা বইয়ে ঠাসা হয়ে গেল। এমন-কী বাড়ির রান্নাঘর এবং সিঁড়ি পর্যন্ত। কয়েক বছরের মধ্যে অবস্থা এমন হল যে তাঁর বাড়িতে তাঁর নিজেরই স্থান হয় না।

বইপাগলা রিচার্ড হেভার তাতে দমবার পাত্র ছিলেন না। মফস্বলে তাঁর দুখানা বাড়ি ছিল। এবার সেই বাড়িতে বই রাখা আরম্ভ হল। আর বিশ্বাস না হলেও সত্যি যে, ঐ দুখানা বাড়ি বইতে ভর্তি হয়ে যাবার পর হেভার নতুন একখানা বাড়ি কিনলেন শুধু বই রাখার জন্য।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, রিচার্ড হেভার নামের এই ভদ্রলোকটি নিজে কখনও একটি বইয়েরও পাতা উলটে দেখেননি। এইভাবে বই সংগ্রহের পাগলামোকে ইংরেজিতে বলা হয় 'বিবলিওম্যানিয়া'। এবং প্রায় দুশো বছর আগেকার লণ্ডনের এই রিচার্ড হেভারের মতো বিবলিওম্যানিয়াক পৃথিবীতে আর একজনও পাওয়া যায়নি।

রিচার্ড হেভারের মৃত্যুর পর তাঁর সংগৃহীত সমস্ত বই নিলাম করা হয়েছিল। তাঁর দেড় লাখের বেশি বই নিলাম করতে সময় লেগেছিল ছ' বছর।

সুবর্ণ-স্বাদের বিস্কিট!

নতুন ডালিমা বিস্কিট এসেছে আপনার জন্য।

ডালিমা বিস্কিট উৎকৃষ্টতার জন্য বছরের পর বছর বহ আন্তর্জাতিক সোনার মেডেল জিতেছে।

লে মণ্ড (বিশ্ব) সিলেক্সন সোনার মেডেল জিতেছে :

১৯৭৭ সালে ব্রুসেল্‌সে
১৯৭৮ সালে জেনেভায়
১৯৭৯ সালে প্যারিসে
১৯৮০ সালে ভিয়েনায়
১৯৮১ সালে এ্যামস্টারডমে

ডালিমা বিস্কিটের জুড়ি নেই

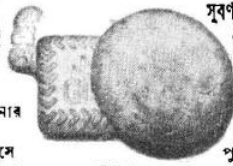

সুবর্ণ-স্বাদের ডালিমা বিস্কিট তুলনাহীন।

স্বাদে ভরা খাস্তা কোকোনাট কুকিস-যত খাবে তত মজা মজাদার পুষ্টিকর গ্লুকোজ বিস্কিট-এ'তে সবচেয়ে বেশী পরিমানে গ্লুকোজ আছে। সোনার মেডেল পাওয়া এ'টাই একমাত্র গ্লুকোজ বিস্কিট।

ডালিমার ক্রীম বিস্কিট চমৎকার নতুন স্বাদে ভরা—অরেঞ্জ ক্রীম, পাইনএ্যাপেল ক্রীম, বাটার ক্রীম। স্বাদে ও গন্ধে তাজা। এ'ছাড়া আছে আরো নানা রকমের স্বাদের বিস্কিট - নোনতা এবং ক্র্যাকার্স।

পাঞ্জাবের সোনা-রংয়ের উৎকৃষ্ট গম দিয়ে তৈরী হয় এই বিস্কিট।

এই বিস্কিটের তাজা স্বাদের জন্য সবসময় পাঞ্জাবের পুষ্টিকর এবং সবচেয়ে সেরাজাতের সোনা-রংয়ের গমই ব্যবহার করা হয়।

ডালিমার কারখানাগুলি পাঞ্জাবেই অবস্থিত।

উত্তর ভারতে ৪০-এর ও বেশী বছরের পরিচিত ও জনপ্রিয় এই ডালিমা বিস্কিট আজ এসেছে আপনার জন্য।

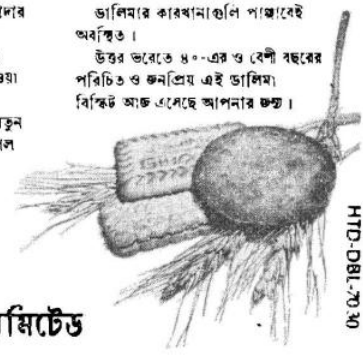

MONDE SELECTION BRUXELLES SELECTION POUR LA QUALITE

উৎকৃষ্ট বিস্কিটের নির্মাতা
ডালমিয়া বিস্কিট প্রাইভেট লিমিটেড

HTD-DBL-7030

কাশীদার হাসি

রঞ্জন ভাদুড়ী

কাশীদার হাসিমুখ
আজো যারা দেখনি
ম্যানিলার পশুশালে
চলে যাও এখনি।
শখ হল বাগানেতে
লাগাবেন ভ্যানিলা,
গেল-বার কাশী তাই
ছুটলেন ম্যানিলা।
মনোমতো লতাটিকে
বাগাবার জন্যে
একাকী ঢোকেন তিনি
গভীর অরণ্যে।
সেই বনে ছিল এক
ডাকাবুকো গরিলা,
'আফ্রিকা থেকে এসে
কেন বাপু মরিলা?'
এই বলে কাশী তাকে
জাপটিয়ে ধরলেন,
দুইটি সবল হাতে
পাঁজাকোলা করলেন।
কাশীদার বাহুপাশে
করে সেটা ছটফট
বনবিভাগের লোক
খাঁচা আনে চটপট।
কাশীদা বলেন হেসে,
'খুব বেশি নয় ওজন,
কোলে করে নিয়ে যাব,
খাঁচার কী প্রয়োজন!'
তাঁর সে বিরল হাসি
দিল চোখ ধাঁধিয়ে,
ম্যানিলা চিড়িয়াখানা
রেখেছে তা বাঁধিয়ে।

ব্যাকরণ-বীর

পবিত্র সরকার

একা-একা যাচ্ছিল
ব্যাকরণ-তীর্থ
সন্ধি-সমাস নিয়ে
চিন্তিত চিত্ত।
মুখটি ফশকে যেই
বলেছেন, "দ্বন্দ্ব!"
চমকে দেখেন, এ কী,
রাস্তা যে বন্ধ!
সম্মুখে ছিল বুঝি
কুণ্ডলী-চক্র,
ফোঁস করে ফণা তোলে
ইয়া এক গোখরো।

পণ্ডিত ঘেমে ভাবে,
"এ কী গেরো, দূর ছাই,
সাক্ষাৎ যমদূত,
যাব বুঝি মূর্ছাই।
মৃত্যু সুনিশ্চিত,
তবু আমি শিক্ষার
গৌরব রেখে যাব,
ভয়ে দিই ধিক্কার।"
সহসা গর্জে ওঠে,
"তদ্ধিত প্রত্যয়!"

মাথা নিচু করে সাপ
ঢুকে গেল গর্তয়।

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য কার্যপ্রণালী কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দুটোই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

স্বরধ্বনিদের ঊর্ধ্বযাত্রা

বাচস্পতি

"ভারি বেয়াড়া তো এই জিভটা." ভণ্টু বলে উঠল, "সবসময় খালি কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা!"

হিগিনকাকু বললেন, "সে সব দেশের সব ভাষার জিভই ও-রকম একটু-আধটু চোট্টামি করে। সেইজন্যেই তো অনেক সময় ভাষা বদলে যায়। ভাষার শব্দের মূল চেহারা বদলে যায়। ধর জার্মান ভাষা। তাতে কোনো শব্দে প্রথমে যদি একটা [+ পশ্চাৎ] স্বরধ্বনি থাকে, তার পরেই যদি থাকে একটা [+ সম্মুখ] স্বরধ্বনি--জিভ আগে থেকেই সামনে এগিয়ে থাকে। ফলে আগের স্বরধ্বনিটা একটা অদ্ভুত চেহারা পায়। ঠোঁট রয়েছে গোল, কিন্তু জিভ এগিয়ে এসেছে। এর নাম 'উম্‌লাউট'। এখানে জিভ পেছন থেকে সামনে ছুটোছুটিতে একটু ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। তুর্কি ভাষাতেও জিভ এইরকম করে। বাংলায় সে কমাবার চেষ্টা করছে ওপরে-নীচে ছুটোছুটি।"

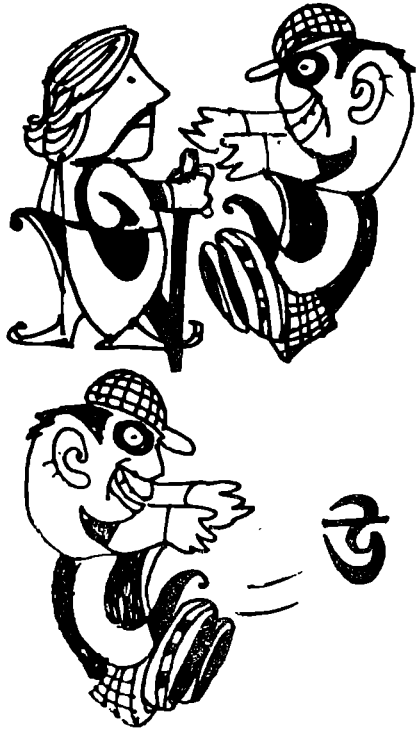

"তা জার্মান জিভের ঐ চালাকির নাম 'উম্‌লাউট', তো বাঙালি জিভের এই চালাকির নাম কী 'লাউট'?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"জার্মানে 'লাউট' মানে ধ্বনি, তা জানো তো?" হিগিনকাকু জিজ্ঞেস করলেন। "তবে বাংলায় জিভের ঐ শর্টকাটের চেষ্টাকে আমরা লাউট-টাউট বলি না। এর একটা বাংলা নাম আছে—'স্বরসংগতি'। ইংরেজিতে 'ভাওয়েল হারমনি' বলে। তবে ইদানীং একটি নতুন নাম দিয়েছে একটি মার্কিনি মেয়ে—'ভাওয়েল হাইট অ্যাসিমিলেশন' বা স্বরধ্বনির উচ্চতার সমীভবন। অর্থাৎ যেটা একটু নিচু স্বরধ্বনি সেটা তার চেয়ে উঁচু স্বরধ্বনির কাছে যাচ্ছে। ফলে

অ	হচ্ছে	ও
অ্যা	,,	এ
এ	,,	ই
ও	,,	উ

আর 'আ' কখনো 'এ' কখনো 'ও' হচ্ছে।"

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন, "সে কী? আমাদের স্বরধ্বনিগুলো এত-সব কাণ্ড করছে নাকি? কই, কিচ্ছু টের পাই না তো আমরা?"

"তার কারণ," বলে হিগিনকাকু আবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "কালো কফি চাই" বলে। তারপরে বললেন, "কারণ হল লেখা। লেখাতে সবগুলো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। এ যখন ই হয় কিংবা ও যখন উ হয় তখন লেখায় বানানে সেটা ধরা পড়ে, যেমন দেশি থেকে দিশি, খোকা থেকে খুকি। 'দে' হচ্ছে 'দি', 'খো' হচ্ছে 'খু'। আ-এর বদল-বানানে লেখা হয় মিঠা থেকে মিঠে, কিংবা জুতা থেকে জুতো—ঠা→ঠে, তা→তো। কিন্তু অ যে ও হচ্ছে, যেমন 'ঘটি'-তে, কিংবা অ্যা যে এ হচ্ছে, যেমন দেখা [দ্যাখা] থেকে দেখুক [দেখুক]—সেটা প্রায়ই বানানে গ্রাহ্য করি না আমরা।"

ভণ্টু বলল, "কিন্তু কথা হচ্ছিল অ নিয়ে। তা এত-সব আনছ কেন?"

"আরে বোকচন্দর, পুরো প্রক্রিয়াটা তো বুঝতে হবে!" হিগিনকাকু ধমকে উঠলেন। "আসছি এখন অ-এর কথায়—" (ক্রমশ)

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

আগে যা ঘটেছে : শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি ? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যায়। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে-ই হয়তো কোনও ওষুধ মেশাত তার খাবারে। ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রাম-ফর্মের সন্ধান মেলে। সান্যালের বাসে উঠে সিংহিবাবু দুর্ঘটনায় জখম। তিনি জানান, শিশিরদেরই প্রতিশোধলিপ্সু আত্মীয় সান্যালের পরামর্শে তিনি ওষুধ খাইয়ে শিশিরকে পাগল করতে চেয়েছিলেন। তারপর···

॥ ২৬ ॥

ছিল এক-রকম, হয়ে গেল অন্যরকম। সমস্ত কিছুই কেমন উলটে পালটে গেল। শিশির এখন আর আগের মতন অত অবাক হতেও ভুলে গিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। একের পর এক ধাক্কা খেতে-খেতে যেমন খানিকটা সয়ে যায়, শিশিরও বারবার অবাক হতে-হতে এখন আর তেমন অবাকও হয় না। কিন্তু সিংহিবাবুর মুখে সব কথা শুনে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

সেদিন আর বংশীর দোকানে যাওয়া হল না। সোজা বাড়ি।

বাড়ি আসার পথে শিশির বলল, "বাবুদা, পিসেমশাইকে একবার জিজ্ঞেস করব ?"

"করবি না কেন ? নিশ্চয় করবি।"

"কিন্তু একবার কলকাতাতেও যেতে হবে। বাবার কাছ থেকে সব শুনতে চাই।"

"যাবার দরকার কী ? চিঠি লেখ।"

চিঠি লেখায় যেন আগ্রহ নেই এমন গলায় শিশির বলল, "চিঠিতে কি এ-সব কাজ হয় ?"

বাবু বলল, "হবে না কেন ? কিসের এমন ভারী কাজ যে, চিঠিতে হবে না।"

শিশির একটু চুপ করে থেকে অন্য কথা তুলল। "সিংহিবাবু যা বললেন তোমার বিশ্বাস হল ?"

"আমার ভাই ভদ্রলোককে খারাপ লোক বলে মনে হল না। মতলব খারাপ থাকলে এত কথা আমাদের বলতেন না।"

"কিন্তু ভবতোষের সঙ্গে সিংহিবাবুর ঝগড়াটা বাধল কেন ? তুমি লক্ষ করে দেখো, সিংহিবাবুর কথা যদি সত্যি হয়, ভবতোষ ঠিক যেমনটি চাইছিলেন সিংহিবাবু তেমনটি করছিলেন না। সিংহিবাবু যেন কম-কম করছিলেন। তাই না ?"

"আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না," বাবু বলল।

"বাঃ, তা হলে শুনলে কী ! সিংহিবাবু তো স্পষ্টই বললেন ভবতোষ আমায় আরও বেশি কষ্ট দিতে চেয়েছিলেন, প্রায় পাগলা করে দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন—সিংহিবাবু সেটা করেননি।"

সামান্য ভাবল বাবু। বলল, "মনে হল, সিংহিবাবু ও-রকম কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করে বলেননি। পরে হয়তো শোনা যাবে।"

দু'জনে কথা বলতে-বলতে হাসপাতালের মাঠ পেরিয়ে কাছে চলে এল। বাবুর হাতে টর্চ। আর সামান্য এগুলেই শিশিরের পিসিমার বাড়ি।

আচমকা কে যেন শিশিরকে ডাকল। দাঁড়িয়ে পড়ল শিশির।

তেঁতুলগাছের অন্ধকার থেকে হেমবাবু বেরিয়ে এলেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা চেহারা। পুলিশের পোশাকের নামগন্ধ নেই।

"আপনি ? এদিকে কোথায় ?" শিশির বলল।

"বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।...এটি কে ?"

শিশির হেমবাবুর সঙ্গে বাবুর পরিচয় করিয়ে দিল।

সামান্য দুটো রগড়ের কথা বলে হেমবাবু-

প্রেমেন্দ্র মিত্র
এবং
ঘনাদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র শুধু ঘনাদার গল্প শুনিয়েই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। বলগাহীন কৌতুক-কল্পনার রাজা 'ঘনাদা'—সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোনো জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের আদি ও অকৃত্রিম মেসবাড়ি আর তার বিচিত্র বাসিন্দারা ঘনাদার সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের অ্যালবামে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। ঘনাদা যেমন নিত্যনূতন, তাঁর কীর্তিকাহিনীও তেমনই চিরনতুন। যতবারই পড়া হোক না কেন, কখনও যেন পুরনো হবার নয়। ঘনাদার অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডকারখানার ভাণ্ডারটিও অবশ্য একই রকমভাবে অফুরন্ত ও অনিঃশেষ। সমান বর্ণময়, সমান আকর্ষক। তাঁরই নতুন ছড়ার বই 'ছড়া যায় ছড়িয়ে'।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বই

আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৬·০০
ঘনাদার ফুঁ ৭·০০
তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০
ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০

আরো অনেক বই

মতি নন্দীর ননীদা নট আউট ৫·০০ এম্পিয়ারিং ১০·০০ স্ট্রাইকার ৭·০০ স্টপার ১০·০০ কোনি ৭·০০ অপরাজিত আনন্দ ১২·০০ ক্রিকেটের আইনকানুন ১০·০০ খেলার যুদ্ধ ১২·০০ মুকুল দত্তের টেবিল টেনিসের আইনকানুন ৪·০০ বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৮·০০ মউলির রাত ৫·০০ বনবিবির বনে ৭·০০ গুগুনোগুম্বারের দেশে ১০·০০ সুকুমার রায়ের সুকুমার সাহিত্যসমগ্র ১ম খণ্ড ২৫·০০ ২য় খণ্ড ৩০·০০ জীবজন্তু ৮·০০ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০ প্রমদাচরণ প্রমদাচরণ সেনের ভীমের কপাল ৭·০০ আনন্দ বাগচীর বনের খাঁচায় ৬·০০।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

শিশিরের দিকে তাকালেন। "বংশীর দোকান থেকে ফেরা হচ্ছে?"

"না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন তবে?"

"এই—" শিশির বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। বলল, "এদিকে বেড়াচ্ছিলাম।"

"কতটা বেড়ানো হল?"

হেমবাবুর গলার স্বরে ঠাট্টা। শিশির বুঝতে পারল। বলল, "ধানোয়ার রোড ধরে অনেকটা গিয়েছিলাম।"

হেমবাবু পকেট থেকে সিগারেটের কেস বার করলেন। ধরালেন। "পুলিশের চোখে অত সহজে কি ধুলো দেওয়া যায়?" বলে হাসলেন।

শিশির একেবারে অপ্রস্তুত।

হেমবাবু নিজেই বললেন, "আমি ভাই আপনাদের ওই সিংহি-র বাড়িতে বাইরে বসে থাকতে দেখেছি। অনেকক্ষণ ছিলেন আপনারা।"

শিশির বলার মতন কিছু খুঁজে পেল না। তার লজ্জা করছিল। কেন সে মিথ্যে কথাটা বলতে গেল!

বাবু বলল, "ধরেছেন ঠিক। আমরা বাজারের দিকেই বেড়াতে যাচ্ছিলাম, সিংহিবাবুকে দেখতে পেয়ে তাঁর খোঁজ নিচ্ছিলাম। উনি ডাকলেন, বসতে হল। গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল।"

হেমবাবু হেসে উঠলেন। "তা হলে মিথ্যে বলার কী দরকার ছিল?"

শিশির অপ্রস্তুত গলায় বলল, "দরকার কিছুই ছিল না হেমবাবু। ভয়ে বললাম। সিংহিবাবু মনে করেন, আমরা আপনাকে বলে, ওঁর পেছনে পুলিশ লাগিয়েছি। ভীষণ খেপে গিয়েছেন। একটু নরম করার চেষ্টা করছি।"

হেমবাবু অনেকটা ঠাট্টার মতন করে বললেন, "সিংহিবাবুর সঙ্গে এখন কি বন্ধুত্ব করা হচ্ছে?"

"না," শিশির সাবধানে বলল, "ওঁর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। দেখা হয়ে গেল। তাই কথা বলছিলাম। কথা বলতে-বলতে দেরি হয়ে গেল।"

হেমবাবু আর কিছু বললেন না। অন্ধকারেই আবার পা বাড়ালেন। "আমি চলি। এদিকেই খানিকক্ষণ থাকব। যান, আপনারা বাড়ি যান।

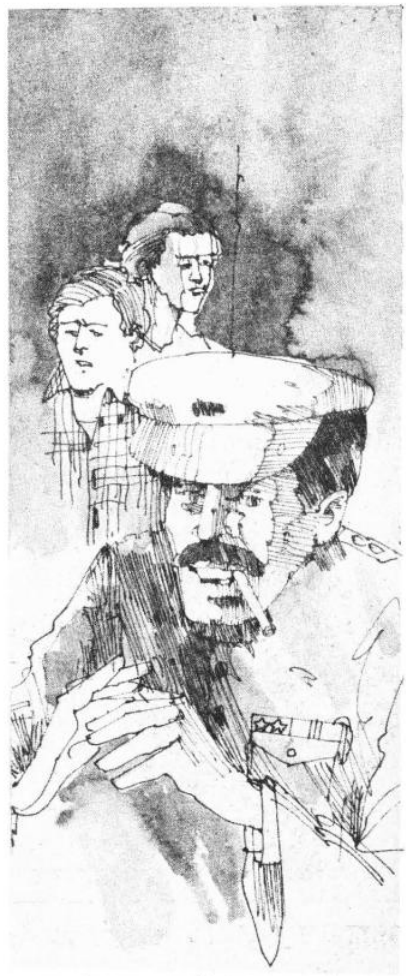

হেমবাবু অন্ধকারেই মিলিয়ে গেলেন।

বাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শিশির বলল, "কী ব্যাপার বলো তো, বাবুদা? হেমবাবু এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

বাবু বলল, "আমি কেমন করে বলব! তোরাই জানিস!"

"সিংহিবাবুর ওপর নজর রাখছেন?"

"হতে পারে।"

শিশিরের হঠাৎ মনে পড়ল, ক'দিন আগে যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে ওদিকে, তার কোনো গন্ধ পেয়েছেন নাকি হেমবাবু? গন্ধ পেয়ে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শশধর ঢাকা বারান্দায় বসে ছিলেন।

শিশিররা বাড়ি আসতেই শশধর বললেন, "এত সকাল-সকাল আজ—?"

"স্টেশনের দিকে যাইনি, এদিকেই ঘুরছিলাম।" শিশির একটা চেয়ার টেনে বাবুকে এগিয়ে দিল। নিজেও বসল অন্য চেয়ারে। দু-চারটে এলোমেলো কথার পর শিশির বলল, "পিসেমশাই, এখানে ভবতোষবাবুকে চেনেন আপনি?"

"ভবতোষ! কোন্ দিকে থাকেন? আমাদের এদিকে তো ভবতোষ বলে কেউ নেই।"

"এদিকে নয়, স্টেশনে ঢোকার আগে ডানদিকে যে বিশাল বাড়ি...।"

"ও, বুঝেছি! না, আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। শুনেছি ওঁর কথা। একদিন বাজারের দিকে দেখেছিলাম। গাড়িতে ছিলেন।"

"ভবতোষবাবুর কথা কিছু শুনেছেন?"

"খুব ধনী লোক। ব্যবসায়ী। কলকাতায় মস্ত ব্যবসাপত্র আছে।"

"আর কিছু নয়?"

"না," মাথা নাড়লেন শশধর। "হঠাৎ ভবতোষবাবুর কথা কেন?"

শিশির একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি একটা কথা শুনলাম। সিংহিবাবু বললেন। ওঁর বাড়িতে বসে-বসে গল্প করছিলাম। ওনার মুখেই শুনলাম।"

"কী শুনলে?"

শিশির বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল একবার, তারপর কথাগুলো বলতে শুরু করল।

শশধর শুনছিলেন। মনোযোগ দিয়েই।

শিশির শোনা কথার সবটা বলল না। প্রথমের দিকটা বলল, পরেরটা চেপে গেল। ভবতোষ আর সিংহিবাবুর দেখাসাক্ষাৎ, কেমন করে শিশিরকে দেখতে পেয়ে গেলেন ভবতোষ, আর তার পর শিশিরকে নিজের মুঠোয় পুরে তার বাবাকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র—এ-সব কথা শিশির একেবারেই তুলল না। তুললেই বিপদ, শশধর নিজে নিরীহ মানুষ, ভয় পেয়ে যাবেন। তার চেয়েও বিপদ হবে পিসিমাকে নিয়ে। পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে একবার যদি পিসিমার কানে যায়—আর রক্ষে থাকবে না। কান্নাকাটি তো কিছুই নয়, পিসিমা আর এক দণ্ড ভাইপোকে এখানে রাখবেন না, নিজেই হয়তো শিশিরকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ছুটবেন। যেন, যার জিনিস তার হাতে জিম্মা করে না দিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

শিশির ঠিক এই সময় কলকাতায় ফিরতে চায় না। ধাঁধার খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে এতদিনে। বাকিটা তাকে জানতেই হবে।

শশধর সব শুনলেন, তার পর বললেন, "অমৃতদা নিজের সব কথা তো বলেন না শিশির। তবে আমি একটু-আধটু শুনেছি। যা শুনেছি তার বারো আনাই তোমার পিসিমার মুখে।"

"পিসিমা জানে?"

"জানে মানে—তার বাবার—অর্থাৎ তোমার ঠাকুরদার কথাটা জানে। কিন্তু পরে যেসব কাণ্ড হয়েছে তার কথা জানে না। জানার সুযোগই হয়নি। আর তুমি তো চেনো তোমার বাবাকে। নিজের মামলা-মোকদ্দমা, মক্কেল এ-সব নিয়ে বাড়িতে গল্প করেন না।"

"সিংহিবাবু আমার ঠাকুরদার কথা যা বলেছেন, তা সত্যি?"

"আমিও মোটামুটি ওইরকম শুনেছি।"

"ঠাকুরদাকে তা হলে খুনই করা হয়েছিল?"

"সেটাই সন্দেহ করা হয়।"

"আমিও শুনেছি। তবে স্পষ্ট করে কেউ বলেনি।"

"বলেনি, কারণ প্রমাণ তো করা গেল না। আমি তো বাবা তখন তোমার পিসেমশাই হইনি, আর তোমার পিসিমার বয়েস তখন পনেরো-ষোলো হবে। তোমার বাবা সদ্য ওকালতি শুরু করেছেন। এত পুরনো কথা মনে রাখাই মুশকিল।... তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি যা শুনেছ সিংহিবাবুর মুখে, সেটা ঠিকই।"

শিশির কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দূরে আওয়াজ শুনল। বন্দুকের। মনে হল ধানোয়ার রোডের দিক থেকেই আওয়াজ এল। দু' দু-বার শব্দ। আওয়াজটা ছড়িয়ে গেল ফাঁকায়। শিশিররা চমকে উঠল।

বাবু বলল, "বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ।"

শশধর উঠে দাঁড়ালেন, "বন্দুক ছুঁড়ছে? কে? এখানে তো বন্দুক ছোঁড়ার লোক নেই।"

ততক্ষণে আশালতাও বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

(ক্রমশ)

ছবি: সুনীল শীল

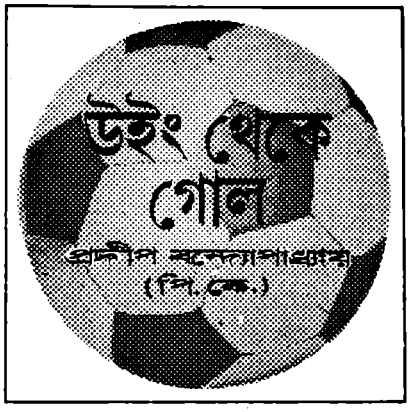

॥ ৩৩ ॥

আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক রিলেশনস অফিসার ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়ের ছেলে ভবভূতি রায়। তিনি বেজায় কড়া লোক হলেও, সহায়দার জন্য দু'টোর সময় ছুটি পেয়ে যেতাম।

দুটোর সময় অফিস থেকে বেরিয়ে কী করতাম, বলো তো? বাঘাদার অজান্তে, লুকিয়ে টেনিস বলে বলকনট্রোল অভ্যাস করতাম। রাজাবাজারের কিছু ছেলেকে ডেকে নিয়ে জোরদার শুটিং প্র্যাকটিসও চলত। দু' পায়ে নিখুঁত আর প্রচণ্ড শট কি সহজে হয়?

কিছু খাওয়ার পর মাঠে এসে টেনিস বল নিয়ে নানারকম প্র্যাকটিস শুরু করে দিতাম। শুনেছি, স্ট্যানলি ম্যাথুজ টেনিস বল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতেন। আমি ম্যাথুজ নই, কিন্তু টেনিস বল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতে বাধা কোথায়? তখন, টেনিস বল চারশো নব্বুইবার পর্যন্ত একটানা নাচাতে পারতাম।

সেদিনও ম্যানশন মাঠে টেনিস বল নিয়ে কসরত চলছে। হঠাৎ একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, আমাদের ক্লাবের মালির মুখ ফ্যাকাসে। কী ব্যাপার? আবার বাঘ—মানে বাঘাদা নাকি? বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি মারতে শুরু করল।

তারপরই পরিচিত ভক্সল গাড়ির আওয়াজ পেলাম। মালি আগেই গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল। কে কে দাস! অফিস পালিয়ে, বাঘাদাকে লুকিয়ে প্র্যাকটিস করছি—একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাবলাম, চাকরিটাই না খোয়াতে হয়!

দাসসাহেব নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। খুব গম্ভীর মুখ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। আমার বুকের মধ্যে হাতুড়িটার ওজন তখন আরও বেড়ে গেছে।

এমনিতে তাঁর মুখে সব সময়েই একটা প্রসন্নতার ছাপ থাকত। সাদা পোশাক ছাড়া পরতেন না। ঈজিপশিয়ান কটনের বুশ-শার্ট আর ফুলপ্যান্ট—সব সাদা। তাঁর কাছ থেকে কত স্নেহ যে পেয়েছি, বলে বোঝাতে পারব না।

কিন্তু ম্যানশন মাঠে ঐ বিকেলে, দাসসাহেবের মুখ দেখে ভয় ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই হচ্ছিল না।

"নমস্কার স্যার।" আমার সর্বাঙ্গে ঘাম, পায়ে কেডস, হাতে টেনিস বল, করুণ মুখ।

মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই তিনি বললেন, "থামলে কেন? প্র্যাকটিস করো!"

"স্যার, অফিস থেকে চলে আসার জন্য মাফ করবেন, আর কখনো...."

"প্র্যাকটিস শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আমার গাড়িতে চলে এসো।"

"স্যার, নোংরা...."

"তুমি এসো।"

গাড়িতে উঠে কোনো কথা বলছিলেন না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার, রাগ করলেন?"

তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, "বাঘাবাবু জানেন?"

"না।"

"তাহলে বাঘাবাবুর কাছে চলো।"

"স্যার, অন্তত এই বিপদে ফেলবেন না।"

"এভাবে লুকিয়ে প্র্যাকটিস করা কি ঠিক?"

তারপর, আর কোনো কথা না বলে ভীম নাগের দোকান। বুঝতেই পারছ, প্রচুর সন্দেশ! তারপর গাড়িতে উঠে আমার বাড়ির দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, "বিকেলে এই প্র্যাকটিসের পর কী খাও?"

"বাড়ি ফিরে যা পাই।"

"এই যে বাড়তি প্র্যাকটিস করছ, তার জন্য কী খাও?"

"এভাবে ভেবে দেখিনি স্যার।"

প্রদ্যোত বর্মণ

কে. কে. দাস

মাঝে গাড়ি থামিয়ে গ্লুকোজ আর হরলিকস কিনে আমার হাতে দিলেন। বললেন, "ফুরিয়ে গেলে বোলো।"

পরদিন অফিসে গিয়ে শুনি হৈ হৈ কাণ্ড। আগে দাসসাহেব জানতেন না। জানতে পেরেই আগের দিন সহায়দাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, "রোজ দুটোর পর কোথায় যায় প্রদীপ?" তারপরই গাড়ি নিয়ে সোজা শিয়ালদহের ম্যানশন মাঠে গিয়েছিলেন।

আসলে দাসসাহেবের দুশ্চিন্তা ছিল, এভাবে অফিস পালিয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছি না তো! আমি বাইরের ছেলে, কলকাতায় খারাপ হওয়ার হাজার রাস্তা খোলা। তাই, এত দুশ্চিন্তা। আজ ভাবি, এমন অভিভাবক কি আজকের ফুটবলাররা কখনও পেতে পারে!

গ্লুকোজ বা হরলিকস ফুরোলেই খবর দিতাম। দাসসাহেব পাঠিয়ে দিতেন। আমার ভাগ্য ভাল, বাঘাদাকে ঐ বিকেলের প্র্যাকটিসের ব্যাপারে কিছুই তিনি বলেননি। বললে....

লীগ জমে গেছে। ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার নিলু মিত্র আমাদের মাঠে যাওয়ার জন্য একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃষ্টির জন্য ত্রিপল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু হঠাৎ ঐ ট্রাকটা খারাপ হয়ে গেল।

সেদিন রথযাত্রা, রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। ট্রামে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। প্রায় ট্রামের তলে এবং ট্রাম তখন চালু।

অন্য যাত্রীরা চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছিলাম। একে তখন চূড়ান্ত চটপটে ছিলাম, তার ওপর প্রাণের ভয়।

কাছাকাছি এমন একজন নিশ্চয় ছিলেন, যিনি আমাকে এবং বাঘাদাকে চিনতেন। তিনি আর দাঁড়িয়ে দেখে যাননি যে আমি উঠে পড়েছি।

তখন আমরা টাউন ক্লাবের টেন্ট ব্যবহার করতাম। পৌঁছে শুনলাম, বাঘাদা খবর পেয়েছেন যে, আমার পা কাটা গেছে। বাঘাদা খুব বকলেন: "চলতি গাড়িতে উঠতে যাও কেন?"

দেখতে-দেখতে মোহনবাগানের সঙ্গে ফিরতি ম্যাচ খেলার দিন এগিয়ে এল। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে মোহনবাগান মাঠে খেলা শুরু হল। গোলটা আমরা হঠাৎই পেয়ে গেলাম।

ডান দিক দিয়ে ঢুকে ব্যাকসেন্টার করেছিলাম। দিনু দাস শট নিলেন। গোলের সামনে দারুণ জটলা, জড়ামড়ি। এবং গোল।

এই ম্যাচ জিতলে আমরা মোহনবাগানের চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে যাব। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাস্তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সব চিন্তায় আমরা যখন মগ্ন, তখন খেলা শেষ হওয়ার নয় মিনিট আগে মোহনবাগান পেনালটি পেল। পেনালটি কিক মারতে এগিয়ে এলেন সমর (বড়ু) ব্যানার্জি। আমাদের গোলে প্রদ্যোত বর্মণ।

নিখুঁত পেনালটি কিক রোখা দুনিয়ার সেরা গোলকীপারের পক্ষেও সম্ভব নয়। ভাল গোলকীপাররা তাই আগে থেকে একটা আন্দাজ করে যে-কোনো একদিকে ঝাঁপায়—যদি কিছু করা যায়। তাই খুব বড় বড় গোলকীপারকেও দেখা গেছে, পেনালটি কিকে উলটো দিকে ঝাঁপ দিয়ে গোল খেতে। ইয়াসিনের মতো গোলকীপারকেও উলটোদিকে ঝাঁপিয়ে ইওসেবিওর পেনালটি কিকে গোল খেতে দেখা গেছে।

আমরা সবাই দুর্গানাম জপছি। ড্র হলে, মোহনবাগান এক পয়েন্ট এগিয়েই থাকবে। আর ধরা যাবে না। এতদিনের সব পরিশ্রম বিফলে যাবে। ভাবা যায় না, ভাবা যায় না!

সমর ব্যানার্জি প্রস্তুত, প্রদ্যোত বর্মণও প্রস্তুত। বড়ুদার ডান পায়ে প্রচণ্ড শট, সেই শট বর্মণের ডান দিক দিয়েই যাওয়ার কথা। সেই শট রোখা খুব কঠিন। বড়ুদা কিন্তু ডান পায়েই, কিন্তু উলটো দিকে—মানে বর্মণের বাঁ দিকে চমৎকার 'পুশ' করলেন। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা আর পঁচাত্তর কিলোগ্রাম ওজনের প্রদ্যোত বর্মণ যেন এক লহমায় একটা ছোট্ট বিড়ালে পরিণত হলেন। হাওয়ায় গোটা শরীর ভাসিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাঁ হাতের চেটো দিয়ে বল বারের ওপর দিয়ে তুলে দিলেন। বড়ুদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। মোহনবাগান-জনতার দীর্ঘশ্বাসে মাঠের আবহাওয়া ভারী হয়ে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম আমাদের 'হীরো' প্রদ্যোত বর্মণকে। (ক্রমশ)

ছবির মজা

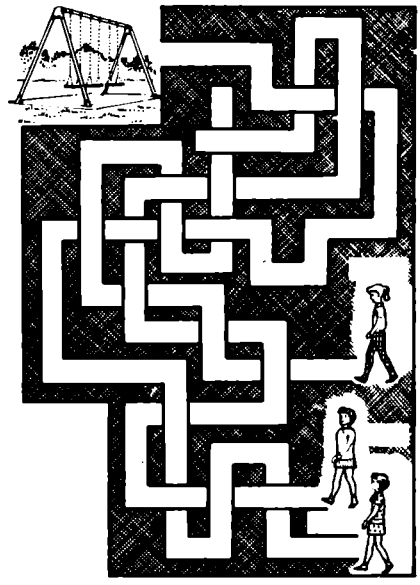

তিন জনে তিন পথে পৌঁছতে চাইছে ওই দোলনার কাছে। কে পৌঁছতে পারবে?

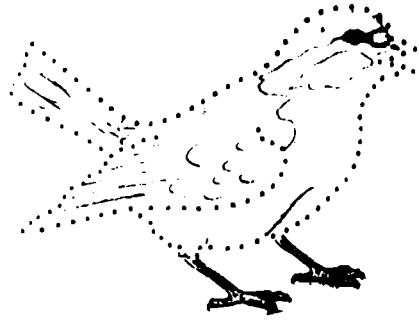

বিন্দুগুলিকে পরপর জুড়ে দিলেই পেয়ে যাবে চমৎকার একটি পাখি।

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

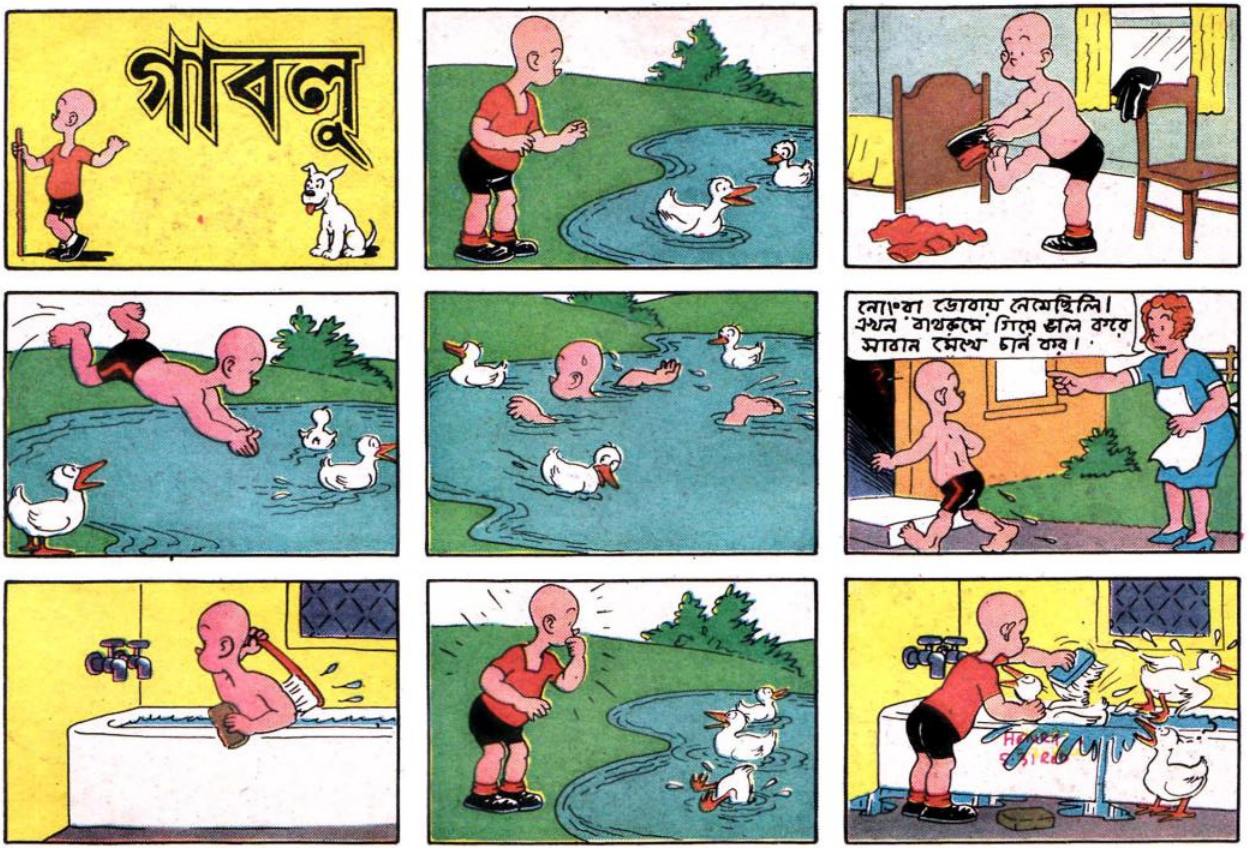

গাবলু
নোংরা ডোবায় নেমেছিলি। এখন বাথরুমে গিয়ে ভাল করে সাবান মেখে চান কর।

সারা বছরের আকর্ষণ
এন.টি.সি.
শাড়ী

লোভনীয় উজ্জ্বল রঙ্গে সর্বাধুনিক প্রিন্ট
চোখজুড়ান সৌন্দর্যের জন্য
রকম্যারি এন. টি. সি.
কাপড়ই কিনুন ১১১টি মিলে তৈরী

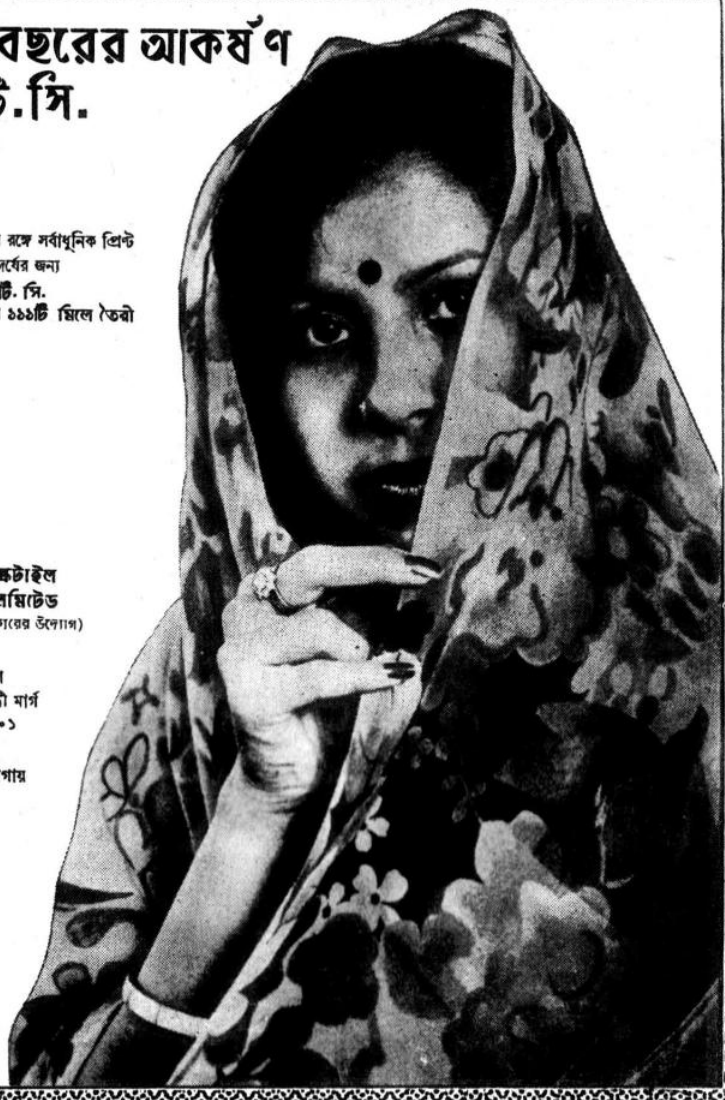

ন্যাশানাল টেক্সটাইল
কর্পোরেশন লিমিটেড
(একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ)
রেজি : অফিস :
৮ তলা সূর্য কিরণ
১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ
নিউ দিল্লী-১১০০০১
এন টি.সি.—
জাতিকে বস্ত্র যোগায়

Newfields

বাবার জন্যে ভাবনা

প্রসাদ

বাবা ভাল হয়ে গেছেন।

"একদম ভাল হয়ে গেছেন, মা?" মিলি জিজ্ঞেস করেছিল।

"Well, his heart will never be as strong as before. So we must all see that he remains as free from cares and anxieties as possible. Nothing is as bad for a weak heart as cares and anxieties, you know." Mummy said.

"Cares and anxieties," thought Milly. "I know I never give him any. But, just a minute. How about my school-reports? I must try and get better reports."

As soon as Milly came to this conclusion she ran to Daddy who was in his study deeply absorbed in a medical journal. He looked up from the journal.

"Yes, Milly? You appear to have something very important to tell me."

"You just wait for my next school-report, Daddy. You can't think how good it's going to be. I'm never again going to give you a moment's care and anxiety."

"Who's been telling you you've been giving me lots of cares and anxiety? And your school-reports haven't been so very bad either, though I wouldn't say they couldn't be better. Now run along, will you, and tell Mummy you and your brother are the great joys of my life."

Milly had never heard Daddy talk like that. She threw her arms around Daddy and it was a few minutes before she could tear herself away from him and run back to Mummy.

আর চম্বল? সে একদিন মাকে বলল, বাবার তো এখন কিছুদিন বেশি গাড়ি চালানো বারণ, তা সে-ই তো গাড়ি-চালানোটা শিখে নিতে পারে। তা হলে আর ড্রাইভার রাখবার দরকার হবে না।

"That's indeed a nice thought, Chambal," Mummy said. "But I'm sure Daddy wouldn't dream of letting you drive the car without a licence. And you'll have to wait a few years for that, yet."

এবারে নীচের বাক্যাংশগুলোর এক-একটি বেছে নিয়ে বাক্যগুলোর ফাঁক ঠিক-ঠিক ভরাট করো:

as bad as/ as strong as/ as fast as/ as free as/

(a) Run——you can.

(b) I felt—air

(c) Few habits are—for health—smoking

(d) The sun's rays are not—at any other time of the day—at noon.

গাবলু

বাঘা

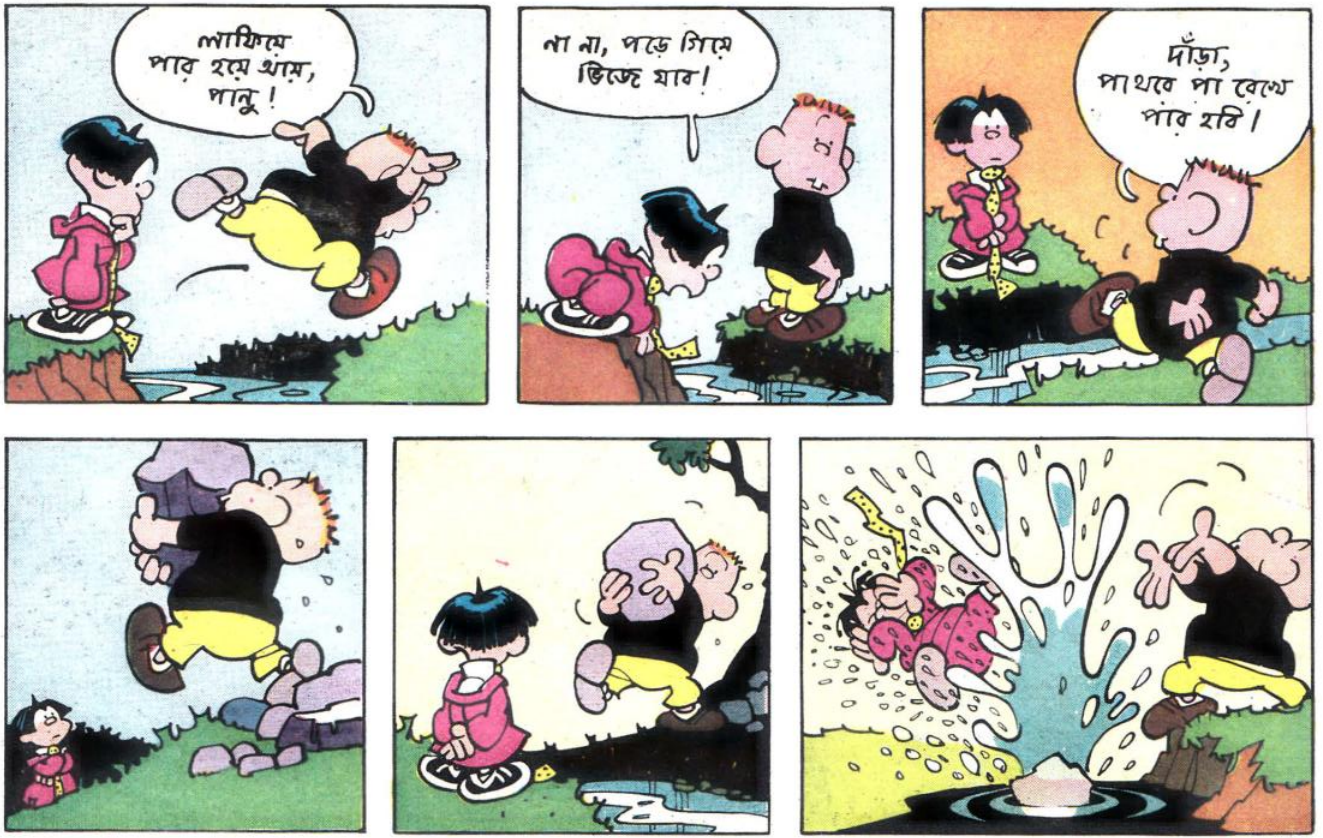

আঁকো

ডিম থেকে পাখি

ডিম থেকে কেউ মা-পাখি হয়ে বাচ্চা পাখিদের দেখাশুনা করছে। এই বাচ্চা পাখিদের তোমাদের ইচ্ছে হলে ডানা মেলে উড়িয়ে দিতে পারো— একটু ভেবে দ্যাখো তো, কেমনভাবে ডানা লাগালে পাখির ছানা পাখা মেলে আকাশে উড়বে।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

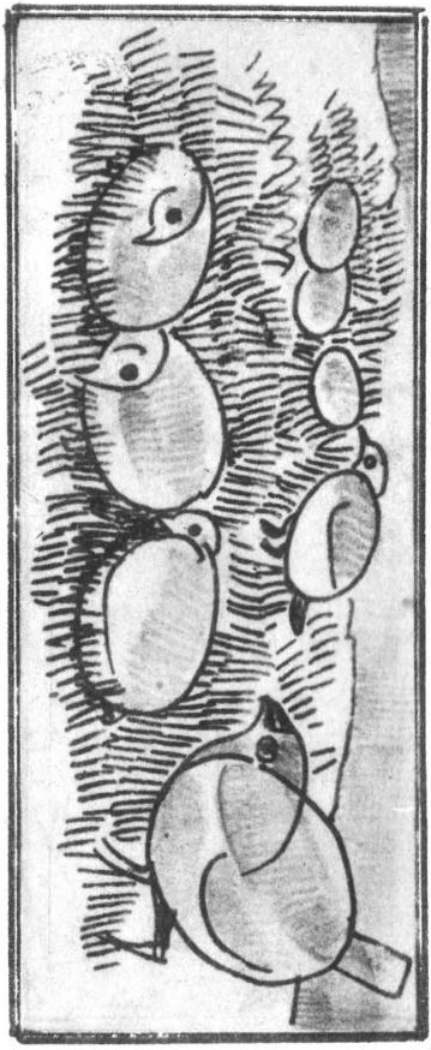

শেখো

কার্ডবোর্ডের কাজ : কলমদানি

মাপমতো চৌকো বোর্ডের টুকরোর তিন ধারে (ওপরে বাদ দিয়ে) ২-৩ ইঞ্চিমতো দাগ দিয়ে নাও। দাগ দেবার পর ভেতর-ভেতর যে চৌকো পাবে তাকে সমানভাবে দুভাগে ভাগ করে "ক" অংশের ওপরটি নকশা-মাফিক ছেঁটে বাদ দিয়ে ঐ আকারে এনে ফ্যালো। দু'পাশের "খ" অংশ দুটি যেমন ভাবে নকশায় দেখানো আছে সেইমতো রেখে কালো অংশটুকু বাদ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা দাগ অনুযায়ী ভাঁজ দিয়ে জুড়ে নিলেই কলম আর পেনসিল রাখার বাক্স পাবে। নীচের দিকে অনায়াসেই রাবার-পিন রাখতে পারো।

জেনে রাখো— কলম রাখার জন্য দুধারের খাঁজগুলো ঠিকমতো মাপে না-কাটতে পারলে জিনিস রাখার পর অসমান দেখাবে।

—কারিগর

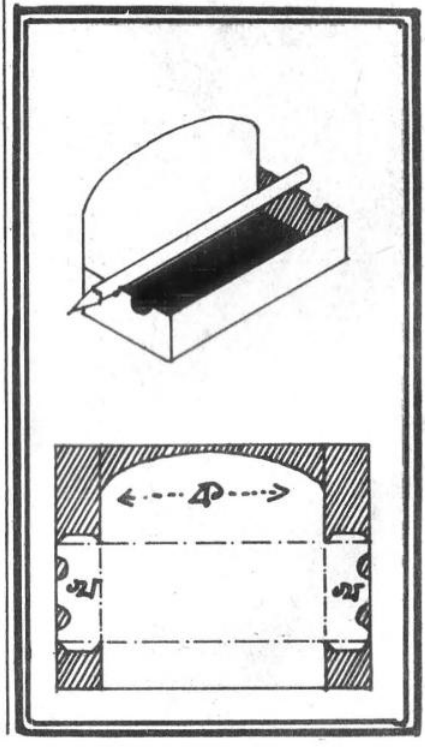

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষ্মীটি,
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !

পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে সুখে সুখে!

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।

জীবন ও হনু, দুই অনুসন্ধানীর আনন্দ

দীর্ঘতম খেলোয়াড়-জীবনের জন্যে!

শত শত বছর ধরে খেলোয়াড়রা পাল্লা দিয়ে চলেছেন সময়ের সঙ্গে। চিরকাল, খেলোয়াড়দের চরম দক্ষতার মাপকাঠি হয়ে এসেছে সময়ের ভগ্নাংশ আর একনিষ্ঠতা! তবু কিছু খেলোয়াড়, বয়েস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, আগেকার খেলোয়াড়দের সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করে সময়ের বিরোধিতা করেছেন।

অলিম্পিক প্রতিযোগীদের মধ্যে একজনের ছিল ৪০ বছরের দীর্ঘতম খেলোয়াড়-জীবন! ড্যানিশ ডঃ আইভ্যান অসিয়ার (১৮৮৮-১৯৬৫)। ইনি অসিক্রীড়ায় রেকর্ড সংখ্যক বার প্রতিযোগিতা করেছিলেন: ১৯০৮, ১৯১২, ১৯২০, ১৯২৪, ১৯২৮ এবং ১৯৩২-এ! ততদিনে এঁর বয়েস হয়েছিল ৬০।

আরেকজন চিরনবীন খেলোয়াড় হলেন ইথিওপিয়ান দূরপাল্লার দৌড়বাজ মিরুৎস্ য়িফতার। ইনি যা করেছেন তা আর কোনো দৌড়বাজ পারেননি: যখন ৫,০০০ আর ১০,০০০ মিটার রেসে জিতেছিলেন তখন এঁর বয়স ছিল ৩৬। (ইনি সুনিশ্চিত নন, তবে আরো বেশী হতে পারেন) এঁর এই কৃতিত্ব ছিল মস্কো অলিম্পিক্স্ ১৯৮০-র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট।

শার্লট ডড্ (১৮৭১-১৯৬০) খেলাধুলোয় জিতে এসেছেন সারাজীবন: উইম্বল্ডন সিঙ্গল্স্-এ ৫ বার, বৃটিশ লেডীজ গল্ফ্ চ্যাম্পিয়ানশিপ একাধিক বার, ধনুর্বিদ্যায় অলিম্পিক রৌপ্য পদক এবং এছাড়া হকি খেলেছেন ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি হয়ে!

সুপার হেভি-ওয়েট লিফ্টারদের মধ্যে যিনি ১০ বছর ধরে নিজের রেকর্ড বজায় রেখে এসেছেন, তিনি হলেন সোভিয়েট দানব— ভ্যাসিলি অ্যালেক্সেভ! ইনি ৮০টি রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন এবং লাভ করেছেন ২টি অলিম্পিক স্বর্ণ পদক! ১৯৮০-তে একজন অল্প বয়সী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে গেছেন, তবে খেলা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে এঁর একেবারেই নেই!

জীবন বীমা আপনার ভবিষ্যতের সুরক্ষার সবচেয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিত উপায়। এ সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নিন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

এরপর: দুই চৌকস অনুসন্ধানী উপলব্ধি করলো স্বাস্থ্যই সম্পদ!

daCunha/LIC/119/81-BN